আধুনিক যুগের ইতিহাস

দে বুক কনসার্ন

Written according to the New Syllabus of History Text Book for Class VIII as directed by the West Bengal Board of Secondary Education. Vide Board's Circular No. Syll./82/5 dated 21.9.82 and Submission No. Syll/H/8/82/82 dated 29.12.82.

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

দেবব্রত বসু এম. এ
অধ্যাপক, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, মেদিনীপুর
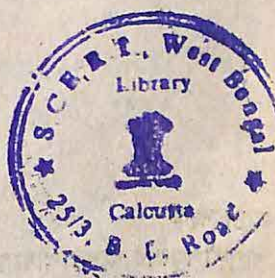
দে বুক কনসার্ন
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
প্রশান্ত দে
১৪এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

[ক্রেতাসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ছাপানো মূল্যের অধিক তাঁহারা যেন না দেন।]

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২
তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৩
চতুর্থ সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৪
পঞ্চম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৪
ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৫
সপ্তম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ১৯৮৭

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস রচনা করিয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকামহলের নিকট হইতে যে অভিনন্দন লাভ করিয়াছি তাহারই প্রেরণায় অষ্টম শ্রেণীর 'আধুনিক যুগের ইতিহাস' গ্রন্থখানি লিখিবার প্রয়াসী হইয়াছি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া অষ্টম শ্রেণীর জন্য 'আধুনিক যুগের ইতিহাস' গ্রন্থখানি লেখা হইল। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও পূর্বের মতই সুধী ও ছাত্রমহলে সমাদর লাভ করিবে।

যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই ঐতিহাসিকের গবেষণা। এই গবেষণা কে কতটা সূক্ষ্মভাবে করিতে পারিল তাহার উপরেই গবেষকের কৃতিত্ব। আমি ইতিহাসের পঠন-পাঠনকালে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বুঝিয়াছি, ইতিহাসের ছাত্রদের সম্মুখে পৃথিবীর ঘটিয়া যাওয়া ঘটনাবলী কিভাবে উপস্থাপিত করিলে সহজবোধ্য হইতে পারে, সেইভাবেই ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

পৃথিবীর ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগ। কিন্তু কোনও যুগ অন্য কোন যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। এক যুগ অন্য যুগের উত্তরসূরী। প্রাচীন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা, বাসস্থান, খাদ্যবস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছুকেই গ্রহণ করিয়াছে। কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই, শুধু রূপান্তর করিয়া লইয়াছে মাত্র।

আদিম মানুষ প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত। তাহারা প্রধানতঃ প্রকৃতির দানকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। বাসস্থান হিসাবে তাহারা পাহাড়ের গুহাকে বাছিয়া লইয়াছিল। অরণ্যজাত ফল-মূল, পশু-পক্ষী তাহাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তাহারা বন্য পশুর আক্রমণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংঘবদ্ধ হইত। পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অমসৃণ পাথর ব্যবহার করিত; পাথরে পাথর ঘষিয়া আগুন জ্বালিত। মধ্যযুগে বহু রূপ-রূপান্তর লাভ করিয়া আধুনিক যুগের মানুষ গগনচুম্বী সৌধে বাস করে। আগুনকে বহু প্রকারে তাহারা ঘরে বসিয়াই উপভোগ করে, আত্মরক্ষায় পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে। সংঘবদ্ধতার রূপ পরিবর্তিত হইয়া পৃথিবীর প্রতিক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক যুগ পূর্ববর্তী যুগকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছে। বর্তমান যুগের

অধিবাসী আমরাও পূর্ববর্তী যুগকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ইতিহাস মানুষের পরিপূর্ণতার প্রতীক। ইতিহাসকে বাদ দিয়া—সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীক—কোন আলোচনাই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। কাজেই ইতিহাস প্রত্যেক শাস্ত্রের জননী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যদি ইতিহাস পাঠে একনিষ্ঠ হয় তবেই সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হইবে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশ, অভিমত ও প্রেরণা পাইয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮১ — বিনীত
পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর — **গ্রন্থকার**

সূচীপত্র

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক মানব জাতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই শতকে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা। পঞ্চদশ শতকে মানুষের চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন আসে তার প্রভাব আজও বর্তমান। আধুনিক বা বর্তমান যুগের গুরুত্ব আমাদের সকলের কাছে অসাধারণ, কারণ আমরা এই যুগেরই মানুষ। তোমরা হয়ত জান যে, মানব জাতির ইতিহাস সঠিকভাবে জানার জন্য ইতিহাসের ধারাকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। ইতিহাসে প্রতিটি যুগেরই বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রতিটি যুগের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মত।

পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল প্রধানতঃ দাস প্রথার উপর নির্ভরশীল। আবার মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্ত প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সামন্ত প্রথায় ছিল অভিজাত ভূস্বামী বা জমিদারদের প্রাধান্য। তাঁরাই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। কিন্তু মধ্যযুগের শেষে বা আধুনিক যুগের সূচনায় ইউরোপে অর্থনৈতিক অবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ঐ সময় সামন্ত প্রথা এক রকম অচল হয়ে পড়ে। রাজারা সামন্তদের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাস প্রথাও ক্রমে লোপ পেতে লাগলো। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার হয়। বণিকশ্রেণী প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়। ফলে সমাজে জমিদার শ্রেণীর বদলে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দেয়। বণিক শ্রেণী সঞ্চিত সম্পদকে মূলধন হিসাবে শিল্পে বিনিয়োগ করতে থাকেন। ফলে

শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়। সমাজে পুঁজিপতি সম্প্রদায় ও ধনতন্ত্রের আধিপত্য দেখা দেয়। কালক্রমে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের শুরু—যা বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক যুগের সূচনায় কৃষিতেও নানা পরিবর্তন আসে। চাষের কাজে কিছু কিছু যন্ত্রের ব্যবহারও শুরু হয়। জমিকে চাষের যোগ্য করে তোলার জন্য ইস্পাতের তৈরি লাঙ্গল ও মই-এর প্রচলন হয়। বীজ বোনা, ফসল কাটা ও ঝাড়াই-এর প্রয়োজনেও যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

মধ্যযুগ পর্যন্ত জমিকে উর্বর করার জন্য সারের বিশেষ ব্যবহার ছিল না। জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য একটি জমিকে তিন বছর চাষের পর ফেলে রাখা হত। এর ফলে চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশ অনাবাদী থেকে যেত। আধুনিক যুগের সূচনায় ঐ অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিন বছর চাষের পর অনাবাদী না রেখে সেই জমিতে ফসলের পরিবর্তন করা হয়। যে জমিতে গম বা যবের চাষ হত সেই জমিতে বীট বা তিন পাতাবিশিষ্ট গাছের চাষ দেওয়া শুরু হয়। ফলে জমি অনাবাদীও থাকে না, আবার জমির উর্বরতাও বাড়তে থাকে। জমিকে উর্বর করার জন্য ব্যাপকভাবে সারের ব্যবহারও শুরু হয়। জমির মালিকগণ বুঝলেন যে, জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার করে সুফল ভোগ করতে গেলে জমির আকার বড় হওয়া প্রয়োজন। শুরু হল ছোট ছোট জমির চাষীদের জমি দখল। ইংলণ্ডে মেষ চরাবার জন্যও জমির মালিকেরা জমি বেড়া দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে ছোট চাষীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। তারা শহরে শিল্প-কারখানায় মজুর বা শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

ক্রুসেডের পর ইউরোপের নতুন ফসলের চাষ শুরু হয়— যেমন, যব, আখ, তুলা, লেবু জাতীয় ফল ও পীচ ফল ইত্যাদি। বাজরা, রেশমগুটি ও লতাগুল্মের চাষও ব্যাপক হয়। শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সব নতুন ফসলের যথেষ্ট অবদান আছে।

কৃষির মত শিল্পেও পরিবর্তন আসে। মধ্যযুগের শিল্প বলতে ছিল কুটীর শিল্প। আধুনিক যুগে যান্ত্রিক শিল্পের সূচনা হয়। মধ্যযুগের একজন কারিগরই একটি শিল্প-পণ্যের পুরোটাই তৈরী করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে একজন কারিগর একটি পণ্যের কিছু অংশ তৈরি করতে থাকেন। সেই সঙ্গে তামা, টিন ও অন্যান্য ধাতু খনি থেকে বের করে নানা কাজে ব্যবহার শুরু হয়। ইংলণ্ড, ফ্লোরেন্স ও জার্মানীতে সুতী ও পশম শিল্পে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন দেখা যায়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলাফল ঃ মধ্যযুগের শেষ দিকে কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গ্রামে স্বাধীন কৃষক শ্রেণী ও শহরে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। নতুন নতুন চাষ-আবাদ ও শিল্পের উন্নতির ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু উৎপাদন প্রণালী উন্নত হওয়ায় আগের যুগের কারিগর ও শিল্পীরা

ধনী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হয়ে সামান্য মজুরে পরিণত হয়। চাষের উন্নতির ফলে জমিদার ও জোতদাররা জমি-জায়গা কিনে মজুর দিয়ে চাষ-আবাদ শুরু করলে অসংখ্য চাষী জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বেকার ও শ্রমজীবীতে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ততন্ত্রের পতনের ফলে কি কি নতুন জিনিসের প্রবর্তন হয়েছিল ?

২। আধুনিক যুগের পরিবর্তন ইউরোপের ইতিহাসে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

২। কৃষির উন্নতির ফলে কি কি পরিবর্তন দেখা দিল ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) সামন্ত প্রথায় ছিল—প্রাধান্য। (খ) সমাজে জমিদার শ্রেণীর বদলে—শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়। (গ) জমিকে উর্বর করার জন্য ব্যাপক হারে—ব্যবহারও শুরু হয়। (ঘ) কৃষির মত—পরিবর্তন আসে।

২। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর কোন্ যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল ?
(খ) প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন্ প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল ?
(গ) মধ্যযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন্ প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ?
(ঘ) আধুনিক যুগের সূচনায় কোন্ কোন্ জিনিসের পরিবর্তন আসে ?

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল দাস প্রথার উপর নির্ভরশীল।
২। মধ্যযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সামন্ত প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
৩। সামন্ত প্রথায় অভিজাত ভূস্বামী বা জমিদারদের প্রাধান্য ছিল।
৪। আধুনিক যুগে কৃষির মত শিল্পেও পরিবর্তন আসে।
৫। শ্রমিক আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংঘ এবং সমাজতন্ত্রবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

---

২ অধ্যায় — ইউরোপের নবজাগরণ

সূচনাঃ মধ্যযুগের লোকের জীবনযাত্রায় উদারতার কোন স্থান ছিল না। মানুষের মনে কুসংস্কার প্রবল ছিল। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারত না। একদিকে সামন্তদের নিষ্পেষণ আর অপর দিকে চার্চের অপরিসীম প্রভুত্ব—এই দুই-এর মাঝে সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। শিক্ষা ছিল ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর জীবন ছিল ধর্মের কঠোর নিয়মে বাঁধা। সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল ভূমিদাস বা সার্ফ। তাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। সামন্ত সমাজ ও চার্চ দেশের অধিকাংশ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল। চার্চ শিক্ষা দিত যে, জীবন সুখ ভোগের জন্য নয়, পরকালের চিন্তায় পুণ্য অর্জন করার জন্য। সেই সময়ে যুক্তি-তর্কের বা স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগই ছিল না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে যে চেতনা তার নাম **নবজাগরণ** বা **রেনেসাঁস**। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর (১৪৫৩ খ্রীঃ) থেকে নবযুগের সূচনা ধরা হয়ে থাকে। কনস্টান্টিনোপল ছিল পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু সেখানে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্যই ছিল বেশী। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর তাঁরা পালিয়ে এসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনা বেড়ে ওঠে এবং নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। কাজেই, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়। ইতিহাসের কোন ঘটনা বা তার ফল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ; এক যুগের মধ্যেই অপর যুগের সূচনার বীজ সুপ্ত থাকে। নবজাগরণও হঠাৎ একদিনে আসেনি, তা ঘটেছিল বহু বছর ধরে। দ্বাদশ শতকে ভাবজগতে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

নবজাগরণের স্বরূপ ঃ 'রেনেসাঁস' কথার অর্থ হল নতুন জীবন বা পুনরুজ্জীবন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহুকালের অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষের মন নানাদিকে ধাবিত হল। গ্রীক ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলার কথা লোকে ততদিন ভুলে ছিল। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ সমাজ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় যাঁদের বলা হয় **'স্কুল মেন'**। তাঁরাই খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রথম চেষ্টা করেন। যুক্তি-তর্ক দিয়ে সব কিছু বিচার করার কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেন নরম্যাণ্ডির এক পাদরী **সেণ্ট আনসেম**। এরপর দ্বাদশ শতকে প্যারিসের এক খ্যাতনামা পণ্ডিত **এলিবার্ড** ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি ঘোষণা করেন জ্ঞানার্জনের প্রথম কথাই হল সন্দেহ এবং যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তার নিরসন করা। সব বিষয়ে মানুষ এখন নিজে অনুসন্ধান করে সত্যে পেঁছিতে চাইল। প্রাচীন কালের দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান সম্পর্কে জানবার জন্য লোকের প্রবল ইচ্ছা জাগল। পৃথিবীকে জানবার ও যুক্তি দিয়ে বিচার করবার জন্য মানুষ ব্যগ্র হয়ে উঠল। গ্রীক ও রোমান যুগের মুক্ত জীবনযাত্রার স্বাদ পেয়ে লোকে আবার জীবনকে আনন্দ-মধুর করবার চেষ্টায় মেতে উঠল। আবার জ্ঞান ও সৌন্দর্যের পূজা শুরু হল। মানবিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ধরে রাখবার জন্য চিত্রকররা চিত্র আঁকল। জীবনকে উপভোগ করবার জন্য শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা চলতে লাগল। তাই নবজাগরণের মূল কথা হল স্বাধীন চিন্তা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সৌন্দর্যের অনুভূতি ও মানবপ্রেম। আর এই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা হলেন মানব প্রেমিক।

নবজাগরণের আভাস পাওয়া যায় মধ্যযুগের শেষদিক থেকেই। মধ্যযুগের নানারকম বাধা-নিষেধ ও কুসংস্কার মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও সকলেই সেই কুসংস্কার ও বাধা-নিষেধকে মেনে নেয়নি। ফলে এই যুগের শেষভাগেই ইউরোপবাসীর মনোজগতে এক নতুন চেতনা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মানুষ পরলোকের চিন্তা ও যাজকের মধ্যস্থতার প্রতি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে লাগল। তারা প্রাকৃতিক কোন ঘটনার মূলে ঈশ্বরের অবদানকে স্বীকার করতে শিখল। তারা যুক্তিবাদী মন নিয়ে জীবনকে অনুসন্ধান করতে লাগল। অপরদিকে ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমশঃ বিকাশ দেখা দিল। সব বিষয়ে প্রশ্ন করবার ও উত্তর জানবার একটা প্রবল আগ্রহ তাদের মনে দেখা দিল। মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়

বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেখানে পণ্ডিতেরা একত্রিত হয়ে বিদ্যাচর্চা করতেন। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। এই আলোচনাই নবজাগরণের জন্ম দিয়েছিল। যুক্তিবাদী মন ও জানার আগ্রহ মানুষকে আধুনিক কালের মানুষে পরিণত করে।

ইটালীতে নবজাগরণের প্রথম বিকাশ: নবজাগরণের সূচনা হয় ইটালীতে। ইটালী ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার কেন্দ্র। ইটালীতে ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস ও রোমনগরী, বিশেষভাবে ফ্লোরেন্স তখন বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। ফ্লোরেন্স নগরে প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্যোক্তা ছিলেন শহরের দুই শাসক **কসিমো ও লরেঞ্জো-দা-মেডিসি**। কসিমো সাহিত্য ও শিল্পের এবং লরেঞ্জো ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। এই সব শহরে রোমের পূর্ব গৌরবের স্মৃতি তখনও বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া, মধ্যযুগের শেষের দিকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পর প্রাচ্যের সঙ্গে এই সব নগরের বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হয় এবং ব্যবসার সূত্রে বিভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মানুষের মন মুক্ত ও উদার হয়ে ওঠে। এখানকার ধনী বণিকগণ রেনেসাঁস আন্দোলনের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে, ইটালীতে একটি নূতন শ্রেণীর অভ্যুত্থান হয়—এই শ্রেণী **ধনিক শ্রেণী**। ধনিকদের উৎসাহে এখানে প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, চিত্রকর ও শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। এই ধনিকদের মধ্যে **মেদিচি** পরিবারের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাই ইটালীতে নবজাগরণের সূত্রপাত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইটালী ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত।

ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে নবজাগরণের প্রসার: ইটালীর নবজাগরণের ঢেউ আল্পস্ পর্বতমালা পেরিয়ে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্ল্যাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে নবজাগরণের সূচনা হয় গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে। স্পেনে **সিডনামের** কবিতা স্পেনীয় ভাষার সাহিত্য রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইটালীর রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা যায় থোমাস মোর-এর রচিত 'ইউটোপিয়া' নামে এক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে আদর্শ সমাজের ছবি পাওয়া যায়। নেদারল্যাণ্ডে নবজাগরণের সূচনা করে "ডেভেণ্টার" নামে এক স্কুল সমিতি। পর্তুগালের নবজাগরণের প্রভাব ক্যামেওনস-এর রচিত "লুসিয়াড" নামে এক মহাকাব্যে দেখা যায়। এই সমস্ত দেশ থেকে দলে দলে বিদ্যানুরাগী জ্ঞান আহরণের জন্য আসতে লাগলেন। তাঁরা ইটালীর শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। ইটালী থেকে জ্ঞান অর্জনের

পর যখন এই সব বিদ্যার্থী নিজ নিজ দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁরা রেনেসাঁসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। তাঁদের প্রচারের ফলে ঐ সমস্ত দেশে রেনেসাঁসের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার সুবিধে হল।

রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের সভ্যতা নতুন রূপ ধারণ করল। জীবন সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনে প্রেরণা জোগাল, নতুন অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করল। মানুষের মনে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ ও প্রসার লাভ করল। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম—সকল ক্ষেত্রেই যুক্তির নির্দেশ প্রাধান্য পেল। সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবসান হয়ে জ্ঞানদীপ্ত আধুনিক যুগের সূচনা হল।

চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদঃ পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মানবতাবাদ। মানবতাবাদী পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের চিন্তা-ধারাকে বর্জন করেন। মধ্যযুগে ধর্মকে ভিত্তি করে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি গড়ে ওঠে। দুরূহ ল্যাটিন ভাষা ছিল সাহিত্যের বাহন। কিন্তু সামান্য সংখ্যক লোক ল্যাটিন ভাষা জানতেন। ফলে, লেখাপড়া ছিল অত্যন্ত সীমিত। মানবতাবাদী পণ্ডিতেরা পরিশীলিত মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ধর্মের বদলে মানুষের ভালো লাগে এমন সকল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। ইটালী, ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

সাহিত্যে নবজাগরণঃ নবজাগরণের ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা পরিলক্ষিত হল। সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি **দান্তের** অবদান উল্লেখযোগ্য। দান্তে ছিলেন ফ্লোরেন্স নগররাষ্ট্রের নাগরিক ও কবি। তিনি ইটালীতে সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। তিনি **ডিভাইন কমেডি** নামক মহাকাব্য রচনা করে ইটালীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। দান্তেকে ইটালীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

মহাকবি দান্তে

মানবতাবাদী মনীষীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন **পেত্রার্ক**। তাঁর চেষ্টায় ইটালীতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর গীতিকাব্য

ও চতুর্দশপদী কবিতা জগদ্বিখ্যাত। তাঁর গ্রীক ও ল্যাটিন প্রীতি ছিল অসাধারণ। দান্তের মত পেত্রার্কও সমকালীন যুগের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী মন তৈরী করেন তার ফলে রেনেসাঁসের সূচনা হয়। রোম নগরীতে তাঁকে কবির প্রাপ্য সম্মান "রাজকবি" উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

পেত্রার্ক

মেকিয়াভেলী

ফ্লোরেন্সের আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন **মেকিয়াভেলী**। তিনি একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থখানির নাম **দি প্রিন্স**। ঐ গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন যে, রাজার লক্ষ্য শক্তিলাভ, অর্থলাভ, মানলাভ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নেই। তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তিনিই প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কথা প্রচার করেন। জনকল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে—একথাও তিনি বলেছিলেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করেন।

বোকাচ্চিও

পেত্রার্কের অনুগামীদের মধ্যে **বোকাচ্চিও** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ছিলেন। পেত্রার্কের মতো বোকাচ্চিও ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম **ডেকামেরণ**। এই গ্রন্থে পাপ, পুণ্য

এবং নরকের মধ্যযুগীয় ভয়াবহ কল্পনার কোন স্থান নেই। এই গ্রন্থের মধ্যে বোকাচ্চিও তৎকালীন সমাজ ও পাদরীদের কুৎসিত জীবন চিত্রিত করেছিলেন। পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও'র প্রচেষ্টায় ইটালীবাসীদের মনে গ্রীক ও রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

ইংলণ্ডেও নবজাগরণের ঢেউ লেগেছিল। ফলে, ইংরেজ জাতির জীবনে এক নতুন জোয়ার এসেছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডে রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করে। ইংলণ্ডে **ক্যাণ্টারবেরী টেলস** নামে ইংরেজী ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচনা করেন **চসার**। সাহিত্যের ক্ষেত্রে **স্পেন্সারের** অবদান উল্লেখযোগ্য। ইনি এলিজাবেথীয় যুগের বিখ্যাত কবি। স্পেন্সারের বিখ্যাত কাব্যের নাম **ফেয়ারী কুইন**। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পুরাকাহিনী তাঁকে মুগ্ধ করত। তিনি পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এছাড়া, তিনি একটি রূপক কাব্যও রচনা করেন।

চসার

রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংরেজী সাহিত্যের **সুবর্ণযুগ** নামে

উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার

স্যার ফ্রান্সিস বেকন

খ্যাত। **উইলিয়াম শেক্‌সপীয়ার, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, এডমণ্ড স্পেন্সার** ঐ যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

শেক্‌স্‌পীয়ার ছিলেন অনন্যসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি তাঁর নাটকে এমন কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেন যেগুলি আজও অমর হয়ে আছে। তাঁর লেখা ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, মার্চেণ্ট অফ ভেনিস প্রভৃতি নাটক আজও ইংরেজী তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর লেখা বহু নাটক পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন **স্যার ফ্রান্সিস বেকন**। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। বেকন ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তিনি ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেন।

নেদারল্যাণ্ডসেও নবজাগরণের ঢেউ লেগেছিল। এখানে বিখ্যাত জ্ঞানী **ইরাস্‌মাস**-এর জন্ম হয়েছিল। তিনি চার্চকে কলঙ্ক ও কলুষতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বহু রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল **দি প্রেইস্‌ অফ ফলি**। তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে ধর্মশাস্ত্র পড়তে বলতেন।

নবজাগরণের যুগে স্পেনও পেছনে পড়ে ছিল না। স্পেনের অমর সাহিত্যিক **সারভান্তিস্‌** এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা **ডন কুইকজোট** নামক গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের 'নাইট' ও তাঁদের বীর ধর্মের এক মনোজ্ঞ ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন। তিনি নাইটদের অতিরঞ্জিত বীরদর্পের কাহিনীর প্রতি কঠোর কটাক্ষ করেছেন।

ফ্রান্সে নবজাগরণের প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে দেখা দেয়। ফরাসী চারণকবিরা একাদশ শতাব্দী থেকেই পৌরাণিক ও লৌকিক বীরপুরুষদের কীর্তি অবলম্বন করে চারণগাথা রচনা করেছিলেন। এ যুগেই বিখ্যাত সাহিত্যিক **রাবেল** জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধর্মের নামে কুসংস্কারের সমালোচনা করেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য রাবেল বিখ্যাত হয়েছিলেন।

রাবেল

শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ : সাহিত্যের মতো শিল্পেও এই সময় ইটালীতে এক নব চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। **লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলো** প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও ফ্লোরেন্সকে গৌরবান্বিত

করেছিলেন। এঁদের আঁকা চিত্রগুলি থেকে এই বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

রাফায়েল

চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক। তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে শেষ নৈশভোজ এবং **মোনালিসা** আজও মানুষের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। রাফায়েল

রাফায়েলের আঁকা বিখ্যাত ছবি ম্যাডোনা

নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তিনি মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

কিন্তু এর মধ্যেই তিনি ছবি এঁকে অমর হয়ে আছেন। তাঁর বিখ্যাত ছবি **ম্যাডোনাতে** শিশু যীশু ও তাঁর মাতার যে কোমল ও পবিত্র সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা সত্যই অতুলনীয়। ফ্লোরেন্স নগরের মাইকেল এঞ্জেলো নানা শিল্পকলায় বিশারদ ছিলেন ; ছবি আঁকতে, পাথরের মূর্তি গড়তে ও ঘর-বাড়ীর পরিকল্পনা তৈরী করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর তৈরী **ডেভিডের মূর্তি** ফ্লোরেন্সে রক্ষিত আছে। রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় তাঁর আঁকা **শেষ বিচার**-এর ছবি জগৎ-বিখ্যাত। সেণ্ট পিটার্স গীর্জা রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মাইকেল এঞ্জেলো

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ : বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগের দান অবিস্মরণীয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে **রোজার বেকনের** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পাটীগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এ্যারিস্টটল সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গবেষণা এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর জীবনের বেশী সময় বিভিন্ন ভাষা, অংকশাস্ত্র, আলোকবিদ্যা, মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় নিয়োজিত করেছিলেন। রোজার বেকনের এই বিজ্ঞান সাধনা সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিনি মনে করতেন যে, যন্ত্রের সাহায্য নিলে মানুষের অগ্রগতি সুনিশ্চিত।

এই সময়ে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান চর্চাও খুবই উন্নত ছিল। এই যুগের বৈজ্ঞানিক ছিলেন **ফ্রান্সিস বেকন**। বিজ্ঞান আলোচনায় বিশ্বাস অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলতেন যে, যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলিকেই কেবল গ্রহণ করা উচিত।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বৈজ্ঞানিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিভাবে বিমান তৈরী করা যায় তা নিয়েও তাঁর গবেষণার অন্ত ছিল না। যুদ্ধের জন্য নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যেও তিনি বহু গবেষণা করেছিলেন। তিনি স্রোতচালিত করাত, পাম্প ইত্যাদি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে **কোপারনিকাস** ও **গ্যালিলিওর** অবদান উল্লেখযোগ্য। এতদিন লোকে জানত যে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র—সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে

ঘোরে। এ কথা অস্বীকার করলে নির্যাতনের অন্ত থাকত না। **পোল্যাণ্ডের** জ্যোতির্বিদ নিকলো কোপারনিকাস প্রথমে এই ভুল ধারণার নিরসন করে বললেন যে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু চার্চ কোপারনিকাসের এই যুক্তি

নিকলো কোপারনিকাস

গ্যালিলিও

মানতে চাইল না। কোপারনিকাসের যুক্তির বাস্তব প্রমাণ দিলেন ইটালীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সত্য প্রমাণ করে দেখালেন। এজন্য চার্চের হাতে তাঁকেও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। গ্যালিলিও বিনা পরীক্ষায় কোন কিছু সত্য বলে গ্রহণ করতেন না। তিনি সকল জিনিসেরই কারণ খুঁজতেন। একদিন গীর্জায় একটি বাতি দুলতে দেখে তিনি ঘড়ির পেণ্ডুলামের নিয়ন্ত্রক আবিষ্কার করেন। এইভাবে কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্ণয় করবার রীতি প্রচলিত করেন। ফলে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়।

মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ঃ মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারও নবজাগরণের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকে খুবই সহজ করে দিয়েছিল। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির মেইন্‌জ্ নগরের **জোহানেস গুটেনবার্গ** মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তন করলেন। ইউরোপের চারদিকে ছাপাখানা স্থাপিত হল। এতদিন

জোহানেস গুটেনবার্গ

বই হাতে লিখে নকল করা হত। তাতে অনেক সময় লাগত, বই সহজে পাওয়া যেত না, বইয়ের দামও বেশী হত। এই সমস্ত কারণে জ্ঞান-চর্চার অভাবে লোক অজ্ঞ থাকত। ছাপাখানায় অল্প খরচে অল্প সময়ে অনেক বই ছাপা সম্ভব হল। এতে
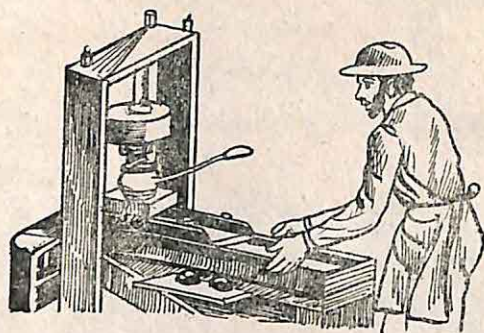
গুটেনবার্গ ও মুদ্রণযন্ত্র

বইয়ের প্রচার বেড়ে গেল। ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটল। হাতে লেখা পুঁথিতে অনেক ভুল থেকে যেত, এখন তা দূর হল। নবজাগরণের নতুন চিন্তা ও শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। "নবজাগরণ" কথাটির অর্থ কি? নবজাগরণের ফলে লোকের জীবনে কি পরিবর্তন দেখা দিল?

২। নবজাগরণের সূচনা হল কিভাবে?

৩। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে নবজাগরণের কি ফল দেখা দিয়েছিল?

৪। আধুনিক ইতিহাসে মুদ্রণযন্ত্রের দান কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। নবজাগরণের পূর্বে ইউরোপের অবস্থা কেমন ছিল?

২। নবজাগরণের স্বরূপ কেমন ছিল?

৩। নবজাগরণের সূচনা ইটালীতে কেন হল?

৪। নবজাগরণে চিত্রকরদের অবদান কি ছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) —ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। (খ) —খ্রীষ্টাব্দকে মধ্যযুগ ও

আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়। (গ) "রেনেসাঁস" কথার অর্থ হল —। (ঘ) নবজাগরণের সূচনা হয় —। (ঙ) ধনিকদের মধ্যে — পরিবারের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। (চ) ডিভাইন কমেডির রচয়িতা ছিলেন —। (ছ) মেকিয়াভেলীর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ছিল —। (জ) স্পেন্সারের বিখ্যাত কাব্যের নাম ছিল — (ঝ) সারভান্তিসের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ছিল —। (ঞ) রাফায়েলের চিত্রগুলির মধ্যে — সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

২। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) কোন্ সময়কে নবযুগের সূচনা ধরা হয়ে থাকে? (খ) রেনেসাঁস কথার অর্থ কি? (গ) সর্বপ্রথম কোথায় নবজাগরণের সূচনা হয়? (ঘ) মেকিয়াভেলীর "দি প্রিন্স"-এ রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) বোকাচ্চিও'র লেখা ডেকামেরণের মধ্যে সমাজের কোন্ চিত্র প্রকাশ পায়? (চ) বিখ্যাত ছবি ম্যাডোনাতে কোন্ চিত্র ফুটে উঠেছে? (ছ) রেনেসাঁস স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোন্‌টি? (জ) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির আবিষ্কারগুলি কি ছিল? (ঝ) মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার কে করেছিলেন?

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। কন্‌স্টান্টিনোপলের পতনের সময় (১৪৫৩ খ্রীঃ) থেকে নবযুগের সূচনা ধরা হয়ে থাকে।

২। রেনেসাঁস কথার অর্থ হল নতুন জীবন বা পুনরুজ্জীবন।

৩। নবজাগরণের সূচনা হয় ইটালীতে।

৪। ইটালীর ফ্লোরেন্সে চিত্রকরদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

৫। রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জাটি স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৬। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন জোহানেস গুটেনবার্গ।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ ঃ পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইটালীর নবজাগরণের যুগের আর এক কীর্তি ভৌগোলিক আবিষ্কার। ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূলে দুটি প্রধান কারণ ছিল—**বাণিজ্য ও ধর্ম**। তাছাড়া নবজাগরণের যুগে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে ধারণাও আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নানা যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ঘটেছে। **সমুদ্রে কম্পাসের** সাহায্যে দিগ্‌নির্ণয় করতে হয়, এবং **এস্ট্রলেব** নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর অক্ষরেখা নির্ণয় করা হয়। কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার পূর্বেই কম্পাস ও এস্ট্রলেবের প্রচলন হয় এবং সমুদ্রযাত্রার উপযোগী উন্নত ধরনের জাহাজও নির্মিত হয়। তাছাড়া নাবিকদের ব্যবহারের উপযোগী মানচিত্র ইত্যাদিও রচিত হয়। ইউরোপের বাইরে যে ধনরত্নপূর্ণ বিশাল এক জগৎ আছে, তার কথাও ঐ সময়ে মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে ইউরোপের লোকেরা জানতে পারে। ইউরোপের লোকজন প্রাচ্যের দেশগুলির সম্পর্কে গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠে।
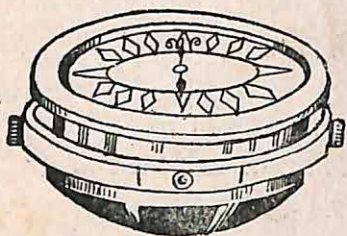
দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র

এই কারণগুলি ছাড়া ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এশিয়ার দেশগুলি থেকে মশলা, মৃগনাভি, চন্দন, ধুনা, তুলা, রেশম, দামী পাথর প্রভৃতি ইউরোপে আমদানী হত। আরব বণিকরা চীন, ভারত, সিংহল প্রভৃতি স্থান থেকে এই সকল জিনিস এনে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে

জলপথে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার

অথবা ভূমধ্যসাগরের তীরের অন্য বন্দরে জমা করত। ইটালীর বণিকরা মিশর প্রভৃতি দেশে এই মাল ক্রয় করে জাহাজে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইটালীর বন্দরে আসত। ইটালী থেকে এই মাল ইউরোপের অন্যত্র চলে যেত। আরব ও ইটালীয় বণিকদের ঐশ্বর্য দেখে ইউরোপীয়রা প্রাচ্যে পৌঁছবার জন্য উৎসুক হত। মসলা দ্বীপের ঐশ্বর্যের কথাও তারা জানত। কিন্তু তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর ঐ পথে বাণিজ্য চালানো অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। সেইজন্য তারা জলপথে ভারত ও চীনে যাওয়ার জন্য পথ খুঁজতে লাগল। এই কাজে প্রথম সফল হয় পর্তুগীজরা।

পর্তুগীজ আবিষ্কারকগণ: পর্তুগীজরাই সমুদ্রপথে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরী এই কাজে অগ্রণী ছিলেন। ইতিহাসে তিনি **নাবিক রাজকুমার হেনরী** নামে পরিচিত। তিনি প্রথম আফ্রিকার অজানা উত্তর-পশ্চিম উপকূল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায়ই মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ

নাবিক রাজকুমার হেনরী

বারথেলোমিউ ডিয়াজ

এবং আজোর্স আবিষ্কৃত হয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক **বারথেলোমিউ ডিয়াজ** আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। পরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে **ভাস্কো-দা-গামা** উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে আরব সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। এইভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে জলপথে ভারতে পৌঁছবার এক নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়।

ভাস্কো-দা-গামার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পর্তুগাল দু' বছরের মধ্যে তেরখানা জাহাজ, বারোশ' পর্তুগীজ নাবিক এবং প্রচুর পরিমাণ পণ্যদ্রব্য নিয়ে কালিকট বন্দরে

পেঁছায়। এটাই পর্তুগাল থেকে দ্বিতীয় বাণিজ্য অভিযান। ঐ সময় থেকেই পর্তুগীজ বণিকগণ বাণিজ্যনীতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করতে লাগল। কিছুদিন পরে ভাস্কো-দা-গামা দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসেন এবং কোচিন ও কান্নোর-এ পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন।

ভাস্কো-দা-গামার সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে কেব্রাল নামে আর এক পর্তুগীজ নাবিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এক শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে একই জলপথ ধরে ভারতে আসেন। তিনি কালিকটে এক বাণিজ্য-কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি কোচিন বন্দরে আসেন। এবং সেখানেও বাণিজ্যকুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা দ্বিতীয়বার কালিকটে এসে কোচিন ও কান্নোর-এ দুজায়গায় পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন।

ভাস্কো-দা-গামা

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ নাবিকদের সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে পর্তুগাল সরকার ভারতে স্থায়িভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা চিন্তা করেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। আলবুকার্কই ছিলেন ভারতে পর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গোয়া দখল করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রথম পর্তুগীজ নৌঘাঁটি ও শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ পর্তুগীজরা দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বোম্বাই এবং বাংলাদেশের হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে।

আলবুকার্ক

স্পেনের আবিষ্কার যাত্রা ঃ পর্তুগালের মতো স্পেনও জলপথে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। স্পেন পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করে আর একটি স্বতন্ত্র পথে ভারতবর্ষে যাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। এই কাজে অগ্রণী

হলেন **ক্রিস্টফার কলম্বাস**। কলম্বাস ছিলেন ইটালীর জেনোয়ার অধিবাসী। তাঁর ধারণা ছিল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবার জন্য একটি সোজা পথ আবিষ্কার করা সম্ভব। মার্কো-পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করে তিনি চীন দেশ ও ভারতবর্ষে আসার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইউরোপে বিভিন্ন রাজার সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় গুরুত্ব দিল না। বহু চেষ্টার পর স্পেনের রাজা **ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলার** সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানা জাহাজ নিয়ে কলম্বাস পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন। পথে তাঁদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। নির্ভীক কলম্বাস কিন্তু কোন বিপদেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে তিনি এক দ্বীপপুঞ্জে এসে উঠলেন।

কলম্বাস

তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। সেজন্য ঐ দ্বীপগুলির তিনি নাম দেন **পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ** ও আদিম অধিবাসীদের নাম হয় **রেড ইণ্ডিয়ান**। কলম্বাস আরও তিনবার আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। চতুর্থ অভিযানের শেষে তিনি আমেরিকার অন্তর্গত নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তিনি যে একটি নতুন মহাদেশের সন্ধান পেয়েছেন তা তাঁর আদৌ জানা ছিল না।

আমেরিগো ভেসপুচি

কলম্বাসের পর **বালবোয়া** নামে স্পেনের এক নাবিক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে মসলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করে পানামা যোজক পার হয়ে এক নতুন সাগরের সন্ধান পান। এই সাগরের নাম দেওয়া হয় **দক্ষিণ সাগর**। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পানামা নগরের প্রতিষ্ঠা হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্লোরেন্সবাসী একজন ইটালীয় নাবিক স্পেনের সাহায্যে ব্রাজিলে এসে পেঁছান। তাঁর নাম **আমেরিগো ভেস্‌পুচি**। তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকাকে একটি মহাদেশ বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নাম থেকেই এই নতুন মহাদেশের নাম হয় **আমেরিকা**। ঐ একই বছর **কর্টেজ** নামে একজন স্পেনীয় নাবিক মেক্সিকো পেঁছান। ঐ অঞ্চলে কর্টেজই সর্বপ্রথম স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন।

সেকালের প্রসিদ্ধ নাবিকদের মধ্যে আর একজন ছিলেন **ম্যাগেলান**। ম্যাগেলান ছিলেন পর্তুগীজ। কিন্তু স্পেনের রাজার অধীনে তিনি চাকরী করতেন। তিনি পাঁচ খানা জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ধরে ক্রমাগত দক্ষিণে যেতে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর একখানা জাহাজ ডুবে যায়। আর একখানা জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ করে জাহাজখানি নিয়ে পালিয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে ম্যাগেলান নতুন এক মহাসমুদ্রে এসে পড়লেন, এই সমুদ্রে ঝড় কম হত। তাই তিনি এর নাম দিলেন **প্রশান্ত** মহাসাগর। তিনি বুঝলেন, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে একটি মাত্র মহাসমুদ্র নেই ; আছে দুটি মহাসমুদ্র এবং এই দুই মহাসমুদ্রের মাঝে আছে এক মহাদেশ। এই আমেরিকা মহাদেশে চারমাস ধরে অসম্ভব কষ্টের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত সমুদ্রযাত্রা করে তিনি এক দ্বীপপুঞ্জে এসে পেঁছলেন। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন ফিলিপ। তাই তাঁর নামেই ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম হল **ফিলিপাইন**। এখানে স্থানীয় লোকদের হাতে **ম্যাগেলান** নিহত হন। কিন্তু তাঁর **ভিক্টোরিয়া** নামে জাহাজটি তিন বছর পরে স্পেনে ফিরে এসে জলপথে সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে।

ম্যাগেলান

এইভাবে পর্তুগাল ভারতে যাবার ঘোরা পথ আবিষ্কার করল। আর স্পেন সোজা পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে আবিষ্কার করল নতুন এক মহাদেশ—**আমেরিকা**। ক্রমে স্পেন থেকে বহু ভাগ্যান্বেষী নাবিক ও পাদ্রী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হয় এবং নতুন মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল ঃ সামুদ্রিক অভিযানের ফলে পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষ নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। মানুষের নবজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ আরম্ভ হল। **দ্বিতীয়ত,** জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণের ফলে পৃথিবীর আকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও তাপমাত্রা সম্বন্ধে বহু নতুন নির্ভুল তথ্য মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করল। **তৃতীয়ত,** নব আবিষ্কৃত দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইউরোপের কয়েকটি দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর অসামান্য গুরুত্ব ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র ইউরোপীয় দেশগুলিতে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য এক পরিবর্তন দেখা দিল। এর ফলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিল এবং ঔপনিবেশিক শোষণ আরম্ভ হল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। **কর্টেজ** ও **পিজারো** নামক দু'জন স্পেনীয় নাবিকের চেষ্টায় মেক্সিকো ও পেরুতে স্পেনীয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। **চতুর্থত,** ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ দেশ-বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রেরণা লাভ করল। ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মনে সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ দেখা দিল। ফলে এশিয়া ও আমেরিকার বহু দেশ ও জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট হল। উপনিবেশ স্থাপনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শুরু হল সেই সকল দেশের অর্থনৈতিক শোষণ। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে এল নতুন দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, বাণিজ্যের মাধ্যমে এল রাজনৈতিক প্রাধান্য ও উপনিবেশ স্থাপন। আর উপনিবেশ স্থাপনের ফলে শুরু হল সে সকল দেশের সম্পদ শোষণ।

আমেরিকা মহাদেশ উপনিবেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে আগ্রহী হয় স্পেনের আক্রমণকারী নাবিকরা। এদের বলা হয় **"কন্‌কুইসটেডরস্‌"**। এঁরা আমেরিকার স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেন ও স্থানীয় লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ চালান।

জাতিসমূহের গঠন ও উত্থান ঃ নব বিজিত ভূ-খণ্ডগুলির জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কার্যকলাপের ফলে পরাধীন দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

রাজশক্তি বৃদ্ধি, সামন্ত প্রথা বিলোপ এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারী ছিল। বণিকেরাও নিজেদের স্বার্থেই শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠে। এর ফলে ইউরোপে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। নবজাগরণের প্রভাবের ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হয়। জাতিগত ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ থেকেই ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। পর্তুগীজদের আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। কলম্বাস ও ম্যাগেলানের সম্বন্ধে কি জান বল।
৩। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সমুদ্রযাত্রার প্রসারের ফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কি?
২। কলম্বাসের অভিযানের বর্ণনা দাও।
৩। প্রশান্ত মহাসাগর কিভাবে আবিষ্কৃত হল?
৪। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ কিভাবে হল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) সমুদ্রে — সাহায্যে দিগ্‌নির্ণয় করতে হয়। (খ) — নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর অক্ষরেখা নির্ণয় করা হয়। (গ) পর্তুগালের রাজকুমার — ইতিহাসে তিনি — নামে পরিচিত। (ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে — ভারতে পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। (ঙ) কলম্বাস ছিলেন ইটালীর — অধিবাসী। (চ) — নাম থেকেই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা। (ছ) ম্যাগেলানের জাহাজটির নাম ছিল —।

২। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) সমুদ্রে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে দিগ্‌নির্ণয় করতে হয়? (খ) কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর অক্ষরেখা নির্ণয় করা হয়? (গ) সমুদ্রপথে ভৌগোলিক আবিষ্কারে কোন্ জাতি অগ্রণী ছিল? (ঘ) ভারতে পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি কে নির্বাচিত হয়েছিলেন? (ঙ) কলম্বাস কোন্ রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন? (চ) কোন্ দেশের রাজার নাম অনুসারে 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ' নাম রাখা হয়েছিল?

৩। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ**

(ক) ভাস্কো-দা-গামা, (খ) কলম্বাস, (গ) ম্যাগেলান।

ঘটনাপঞ্জী

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ—বারথেলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ—ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পৌঁছান।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ—আলবুকার্কের নেতৃত্বে ভারতে পর্তুগীজদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা হয়।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ ছিল বাণিজ্য ও ধর্ম।

২। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরী "নাবিক রাজকুমার হেনরী" নামে পরিচিত ছিলেন।

৩। আলবুকার্ক ছিলেন ভারতে পর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

৪। আমেরিগো ভেসপুচির নাম থেকেই আমেরিকা মহাদেশের নাম হয়।

৫। ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

---

৪ অধ্যায়

ইউরোপের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন

ষোড়শ শতকে ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে **ধর্ম সংস্কার আন্দোলন** বলে। নবজাগরণের ফলে ইউরোপের মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা সমালোচনার স্পৃহা এবং পুরাতন বা প্রচলিত ঘটনার বিরোধিতা করার মনোভাব গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা শুরু হয় তার পরিণতি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।

(ক) **ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির প্রতিবাদ ঃ** ষোড়শ শতকে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মের প্রধান রোমের পোপ আড়ম্বর, দুর্নীতি, অজ্ঞতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, কুসংস্কারকে সত্য বলে ধর্মের নামে অপপ্রচার করেছিলেন। এদিকে নবজাগরণের ফলে প্রাচীন ভাষায় লেখা বাইবেলের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হল। ছাপাখানার আবিষ্কার এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় বাইবেল অনূদিত হওয়ায় লোকের ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। আগে দুরূহ ল্যাটিন ভাষায় লেখা বাইবেল সাধারণ মানুষে পড়তে পারত না। কিন্তু নবজাগরণের ফলে ঐ অসুবিধা না থাকায় প্রকৃত ধর্ম কি তা জানতে পেরে ধর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ষোড়শ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের রূপকার ছিলেন জার্মানির **মার্টিন লুথার**। কিন্তু লুথারের অনেক আগেই ক্যাথলিক ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়।

ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দুঃসাহসিক সংস্কারপন্থী অধ্যাপক **জন ওয়াইক্লিফ** (১৩২৪-১৩৮৪) সর্বপ্রথম পোপ ও গীর্জার রীতিনীতি ও ক্যাথলিক

ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করেন। ওয়াইক্লিফকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 'শুকতারা' বলা হয়। তিনি প্রথমেই যাজকদের নৈতিক অধঃপতন ও ক্যাথলিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি পোপের অর্থের লোভ, পোপের প্রাসাদের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাজকদের রাষ্ট্রের চাকুরী গ্রহণ, তাদের ভোগবিলাস ও নৈতিক অধঃপতন। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। তিনি প্রচার করেন যে, একমাত্র সৎ ও পবিত্র মানুষই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। নিজের মতবাদ প্রচার করার জন্য ওয়াইক্লিফ কিছু গরীব সৎলোকদের নিয়ে এক সংস্থা গঠন করেন। এদের বলা হত **"লোলার্ড"**। প্রকৃতপক্ষে ওয়াইক্লিফের সময় থেকে ইংলণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

জন হাস্

জার্মানির অন্তর্গত বোহেমিয়ার জন হাস্ ছিলেন ওয়াইক্লিফের ধর্মমতে বিশ্বাসী। হাস্ ছিলেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ক্যাথলিক গীর্জার দুর্নীতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করার অপরাধে হাস্‌কে বিধর্মী বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। জার্মানিতে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন জন হাস্।

ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ)। জার্মানিতে এক কৃষক পরিবারে জন্ম। লুথারের বাবার ইচ্ছে ছিল লুথার বড় হয়ে আইন ব্যবসা করবেন। কিন্তু লুথার গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে যান। সেখানে তিনি পোপ ও যাজকদের ভোগ-বিলাস, আড়ম্বর, দুর্নীতির বিষয় স্বচক্ষে দেখার পরে তাঁর মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। কয়েক বছর পরে পোপের প্রতিনিধি কর্তৃক ক্ষমাপত্র বিক্রির এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি বিদ্রোহ করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য এই ক্ষমাপত্র বিক্রি করা হত। ক্ষমাপত্র কিনলে যে-কোন পাপী মুক্তি পেত—এই রকম ভুল ধারণা চলে আসছিল। পোপের প্রতিনিধি **টিটজেল** জার্মানিতে ক্ষমাপত্র বিক্রি শুরু করলে

লুথার প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা করেন। লুথার পচাঁনব্বইটি সূত্রের সাহায্যে ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন। পোপ লুথারকে খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতার অপরাধে এক নির্দেশনামায় বহিষ্কার করেন। লুথার পোপের ঐ নির্দেশনামা জনসমক্ষে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন এবং পোপের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন। লুথার ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ **প্রোটেস্ট্যাণ্ট** নামে পরিচিত হন। লুথারের মতবাদ প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টধর্মে **ক্যাথলিক** ও **প্রোটেস্ট্যাণ্ট**—এই দুই ভাগ দেখা দেয়। এ বিষয় পরে আলোচনা করা হবে।

মার্টিন লুথার

(খ) **ফলাফল**: মার্টিন লুথারের সময় জার্মান সম্রাট ছিলেন **পঞ্চম চার্লস**। জাতীয়তাবাদী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের নেতৃত্ব করার জন্য লুথার তাঁকে আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি তখন উত্তর ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে খুবই বিব্রত ছিলেন। ইটালীতে ফরাসী সম্রাট ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পোপের সমর্থনের প্রয়োজনও তাঁর ছিল। সেইজন্য তিনি লুথারের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে লুথারকে বিচারের জন্য ডাকলেন **ওয়ারমস্** শহরের একটি সভায়। ঐ সভায় লুথার দৃঢ়ভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করে পোপ লিও ও জার্মান সম্রাটকে উপেক্ষা করলেন। জার্মানিতে বহু সংখ্যক লোক লুথারের মতবাদ গ্রহণ করে। বিভিন্ন সমস্যায় জড়িত থাকায় সম্রাট পঞ্চম চার্লসের পক্ষে লুথারের বিরুদ্ধে ওয়ারমস্ সভার প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হল না। জার্মানির জাতীয়তাবাদী শাসকগণ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিলেন পোপের বিরোধী। তাঁরা লুথারের দলে যোগ দিলেন। স্যাক্সনীর ইলেক্টর লুথারের সমর্থক ছিলেন। পঞ্চম চার্লসের অসুবিধা আর লুথারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের মধ্যে দ্বিমত থাকায় জার্মানিতে লুথারের মতবাদ বিনা বাধায় প্রসারলাভ করে। জার্মানিতে লুথারের আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলন। বহু জার্মানের কাছে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ছিলেন স্পেনীয় আর পোপ ইটালীয়—উভয়েই বিদেশী। জার্মানদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ জার্মানিতে লুথারের সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন কেবল জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অল্পদিনের মধ্যে

ইউরোপের নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব দেশে জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট রাজাদের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় গীর্জা প্রতিষ্ঠা হয়। ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীরা ফ্রান্সে 'হিউগনো', স্কটল্যান্ডে 'প্রেসবিটেরিয়ান' এবং ইংলণ্ডে 'পিউরিটান' ও 'প্রোটেস্ট্যান্ট' প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত ছিল।

জার্মানির পর **সুইজারল্যাণ্ডে** ধর্ম সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়। সেদেশে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন **জুইঙ্গলী**। তিনি পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করায় রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। জুইঙ্গলির মতে, ধর্ম পালনের জন্য উপবাস, ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা প্রভৃতি পরিচালনার প্রয়োজন নেই।

জুইঙ্গলির পরে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন **জন কেলভিন**। প্রথমে তিনি ছিলেন লুথারের অনুগামী কিন্তু চার্চে নিয়ম প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে কেলভিন ও লুথারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেলভিন বাইবেলের বাইরে কোন নিয়ম কানুন চার্চে প্রবর্তন করার তীব্র বিরোধী ছিলেন; কিন্তু লুথারের মধ্যে ঐ প্রথার গোঁড়ামি ছিল না। কেলভিন মনে করতেন যে, চার্চে পুরানো নিয়ম-শৃঙ্খলার পুনরায় প্রবর্তন শুভ ফলদায়ক। ধর্মে অনুরক্ত, চরিত্রবান কিছু লোকজন নিয়ে কেলভিন একটি সংঘ গঠন করেন। ঐ সংঘের ওপর ধর্মব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংঘের সদস্যরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

জন কেলভিন

লুথার রাজা, ধনীসম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রভৃতির উগ্র বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু কেলভিন ধর্ম বিষয়ে ধনীসম্প্রদায়ের প্রভাব বা হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। লুথার চার্চের মূল কাঠামো বজায় রেখে সংস্কার প্রবর্তন করতে চাইতেন, কিন্তু কেলভিন চার্চের আমূল সংস্কার প্রবর্তনে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি চার্চের সংগঠনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন।

লুথার, কেলভিন প্রমুখ ধর্ম সংস্কারক তাঁদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মাধ্যমে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

ইংলণ্ডেও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ লাগে। ইংরেজরা বিদেশী পোপের

আধিপত্য সহ্য করতে আর আগ্রহী ছিলেন না। ইংলণ্ড-রাজ **অষ্টম হেনরী** প্রথমে পোপের সমর্থনে লুথারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে একটি বই লেখেন। পোপ অষ্টম হেনরীকে **ধর্ম সংস্কারক** উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যাপারে পোপের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। পোপ অষ্টম হেনরীর সঙ্গে স্পেনরাজ পঞ্চম চার্লসের আত্মীয়া ক্যাথারিনের বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে সম্মতি দেননি। রাজা অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সাহায্যে একটি আইন পাস করে পোপের বদলে ইংলণ্ডের চার্চে রাজার কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ বিশপ **ক্যানাষার** ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। রাজা অষ্টম হেনরী ঐ বাইবেল অনুযায়ী ইংলণ্ডের চার্চে প্রার্থনা করার আদেশ দেন। তার ফলে পোপের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়।

চতুর্দশ শতকে জন ওয়াইক্লিফ্ ও তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টা এবং কলেট, স্যার টমাস মোরে প্রমুখ মনীষীর প্রচারের ফলে ইংরেজগণ পোপ ও ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী হয়ে পড়েন। ইংরেজদের জাতীয়চেতনাবোধ, রাজা অষ্টম হেনরীর ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতি ইংলণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সহায়ক হয়ে ওঠে। অর্থ সংগ্রহের জন্য ও দুর্নীতি দমনের অজুহাতে রাজা অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের মঠগুলির উচ্ছেদ করেন। মঠগুলির সম্পদ নিয়ে রাজা একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। মঠের জমি-জায়গা রাজা নিজের অনুচরদের মধ্যে বণ্টন করে তাঁর একটি অনুগত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সাধু **জননকস্**। তিনি ছিলেন জন কেলভিনের অনুগামী। স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। সেখানে প্রাচীনদের সভা নামক সংস্থাটি স্কটল্যাণ্ড থেকে ফরাসীদের বিতাড়নের জন্য ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। স্কটল্যাণ্ডে প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমত প্রচারিত হয়।

(গ) (১) **ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ** ষোড়শ শতকে কিভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী মতামত ইউরোপে অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে পূর্বেই জানা গেছে। এখন ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য ক্যাথলিক চার্চ যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছিল সে বিষয়ে বলা হচ্ছে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের দ্রুত প্রসারে ক্যাথলিক চার্চ আতঙ্কিত হয়ে ঐ ধর্মমতের প্রসার ব্যাহত করার জন্য ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার প্রবর্তন করে ; কেবল সংস্কার প্রবর্তন নয় আরও কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছিল যেগুলিকে প্রতি-ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (Counter Reformation) বলা হয়। ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের মধ্যে মতবিরোধ

থাকায় ঐক্যবদ্ধ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা সুবিধা পায়। তাছাড়া ঐ সময় পোপ এবং কিছু কিছু যাজকের নৈতিক চরিত্রের মান ছিল উন্নত—যা তাঁদের পূর্ববর্তী পোপ ও যাজকদের ছিল না। পোপরূপে **তৃতীয় পল** নির্বাচিত হওয়ার পর ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে যুক্ত যাজকগণ নতুন প্রেরণা লাভ করেন। পারিবারিক সম্পর্ক বা অর্থনৈতিক লাভের প্রতি নজর না দিয়ে যোগ্যতা ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই ধর্মীয় পদগুলিতে নিয়োগ করা হতে থাকে।

কেবলমাত্র ক্যাথলিক চার্চে সংস্কার প্রবর্তন এবং পোপ ও যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি ; আরও কয়েকটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল—ঐ সকল বিষয়েও আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ধর্মীয় বিচারালয় বা **ইনকুইজিসান কোর্টের** উল্লেখ করা হয়। ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী ব্যক্তিদের বিচার এবং শাস্তিদানের জন্য ঐ বিশেষ ধর্মীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ বিচারালয়ের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের ঐ বিচারালয় কঠোর সাজা দিত।

ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য **জেসুইট** সম্প্রদায় বিশেষভাবে অগ্রণী ছিল। জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন **ইগনাসিয়াস লয়লা** নামক জনৈক স্পেন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিকরূপে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় তিনি সৈনিকের জীবন ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। প্যারীতে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় পলের স্বীকৃতি দানের পর প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিহত করবার জন্য জেসুইটগণ আত্মনিয়োগ করে। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা জেসুইটগণের মধ্যে বজায় ছিল। জেসুইটগণ শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে এবং ধর্মপ্রচার ও আলোচনার মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। জেসুইটগণ রাজনীতি, কূটনীতি এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মকে রক্ষা ও প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম রক্ষা পায় এবং ব্যাভেরিয়া, দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডস, বোহেমিয়া এবং হাঙ্গেরীতে ক্যাথলিক ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকে। জেসুইটগণের প্রচেষ্টায় ভারত, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রসার রোধ করার ক্ষেত্রে **কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট** নামক সংস্থাটিও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৫৪৫-১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যবর্তীকালে মাঝে মাঝে সংস্থাটির অধিবেশন বসে। ঐ সকল অধিবেশনে ক্যাথলিক মতবাদের সুস্পষ্ট

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই সভায় সাধারণভাবে গীর্জার আদর্শ ও ধর্মের তত্ত্ব স্থির করা হয়। ধর্মের ব্যাপারে পোপের নির্দেশ চরম বলে স্বীকার করা হয়। ক্যাথলিক চার্চে শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা হয়—ফলে বেশ কিছু লোক প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ ব্যাখ্যা করে ক্যাথলিক মতবাদে ফিরে আসে।

(২) **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ ঃ** পবিত্র রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লস জার্মানির প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দমন করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পঞ্চম চার্লস মনে করতেন ধর্মের বিরোধকে কেন্দ্র করে তাঁর সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হয়ে যাবে। ফ্রান্স, পোপ ও তুরস্কের সঙ্গে বিরোধে ব্যস্ত থাকার জন্য সম্রাট চার্লসের পক্ষে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের অঙ্কুরেই বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক সমস্যার সমাধানের জন্য চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দমন করার কাজে মন দেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেস্ট্যাণ্টগণ কাউন্সিল অফ ট্রেণ্টকে বৈধ বলে স্বীকার না করায় সম্রাট পঞ্চম চার্লস জার্মানির রাজ্যসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্যসংঘের মধ্যে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। প্রথমদিকে চার্লস সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু জার্মানিতে স্পেনীয় সৈন্যের উপস্থিতির ফলে জার্মানদের জাতীয়তাবাদ জেগে ওঠে। ফ্রান্সের শাসক দ্বিতীয় হেনরীর বন্ধুত্ব লাভের পর জার্মানির প্রোটেস্ট্যাণ্টগণ চার্লসের সেনাবাহিনীকে জার্মানি থেকে বিতাড়িত করে। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে **অগস্‌বার্গের** সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে জার্মানিতে লুথারবাদ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়। জার্মানির প্রতিটি রাজ্যের রাজা ধর্ম ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পান। রাজার ধর্মই প্রজাদের ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়।

(ঘ) **নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা ঃ** স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর শাসনাধীন নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের উৎখাতের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ঐ প্রচেষ্টার ফলে নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু কেবল ধর্মনৈতিক কারণে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয়নি—আরও অনেকগুলি কারণের সমন্বয়ে নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নেদারল্যাণ্ডে বিদেশী স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির ফলে ডাচগণ (নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসী) অপমানিত বোধ করেন। দেশশাসনে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবর্তে স্পেনীয়দের নিয়োগেও ডাচগণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। স্পেনরাজ ডাচদের ওপর করের বোঝা এমনভাবে ধার্য করেন এবং ডাচদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন সব বাধা-নিষেধ আরোপ করেন যে, ডাচদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। পঞ্চম চার্লসের আমল থেকেই নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ওপর ইনকুইজিসান কোর্টের

মাধ্যমে দমন-পীড়ন চলতে থাকে। তবু প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত অব্যাহত থাকে। আবার পঞ্চম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন উগ্র ক্যাথলিক। তাঁর আমলে নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন হতে থাকে। দেশে স্পেনরাজের শাসনের বিরুদ্ধে এমন অসন্তোষ দেখা দেয় যা কালক্রমে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয় ফিলিপ

দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নির্যাতনের বিরুদ্ধে ডাচগণ স্পেনরাজের প্রতিনিধির কাছে এক অভিযোগপত্র পেশ করেন। অভিযোগের প্রতিকারের পরিবর্তে শাসকগণ দম্ভ প্রকাশ করায় নেদারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক গীর্জা, ছবি, মূর্তি প্রভৃতি ধ্বংস করা হয়। ডাচদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ডিউক অফ আলভাকে পাঠান। আলভার বিরুদ্ধে **উইলিয়াম** অফ **অরেঞ্জের** নেতৃত্বে ডাচগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ডাচগণ এখন অভিযোগগুলির প্রতিকারের পরিবর্তে দেশের মাটি থেকে বিদেশী স্পেনীয় শাসনের অবসানের জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। আলভার অত্যাচারে একদল ডাচ দেশছাড়া হন। তাঁরা ব্রিলি নামক স্থান দখল করার পর যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হয়। ব্রিলির পতনের খবরে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাচগণ একের পর এক শহর থেকে স্পেনীয়দের হঠিয়ে দেন। একসময় বিদেশী স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। কিন্তু স্পেনরাজের প্রতিনিধি **ডিউক অফ পার্মার** কার্যকলাপের ফলে ক্যাথলিকগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। নেদারল্যাণ্ডের দক্ষিণের রাজ্যগুলি ছিল ক্যাথলিক আর উত্তরদিকের সাতটি রাজ্য ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট। উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ উত্তরের সাতটি রাজ্য নিয়ে **ইউনিয়ন অফ ইউট্রেক্‌ট্‌** নামক রাজ্যজোট গঠন করে ডাচ সাধারণ-তন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মরিস স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডাচদের নেতৃত্ব দেন। বিশাল নৌ-বহর 'আর্মাডা' ধ্বংস করে ইংলণ্ড ডাচদের সাহায্য করে। আর্মাডার ধ্বংসের ফলে স্পেন এমন শক্তিহীন হয়ে পড়ে যে, তার পক্ষে নেদারল্যাণ্ডে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনরাজ নেদারল্যাণ্ডে ইউনাইটেড প্রভিন্সের স্বাধীনতা

স্বীকার করে নেন এবং ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়েস্টফেলিয়ার** চুক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। উত্তর নেদারল্যাণ্ডের প্রদেশগুলি নিয়ে অর্থাৎ হল্যাণ্ডের ১১০টি ক্ষুদ্র প্রদেশ নিয়ে ডাচ সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। ডাচ সাধারণতন্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অপরদিকে নেদারল্যাণ্ডে দক্ষিণের ক্যাথলিক রাজ্যগুলি স্পেনের অধীনে থেকে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড **বেলজিয়াম** নামে পরিচিত হয়।

(ঙ) **ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য দ্বিতীয় ফিলিপের প্রয়াস** ঃ ইংলণ্ডে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক—এই দুটি উদ্দেশ্যেই ফিলিপ তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী মেরী ছিলেন ক্যাথলিক। মেরীর সঙ্গে ফিলিপের বিবাহের ফলে ইংলণ্ডে ফিলিপ তথা ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। কিন্তু মেরীর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাণী হন **প্রথম এলিজাবেথ**। তিনি ফিলিপকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। এলিজাবেথ ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ইংলণ্ডে ক্যাথলিকগণ এলিজাবেথের বদলে স্টুয়ার্ট বংশীয়া মেরীকে রাণী করার জন্য এক চক্রান্ত করেন। এলিজাবেথের আত্মীয়া মেরী স্কটল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংলণ্ডে এলিজাবেথের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্যাথলিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর মেরীর প্রাণদণ্ড হয়। এরপর ফিলিপ এলিজাবেথকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বিশাল নৌ-বহর গঠন করেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যে বিশাল নৌ-বহর গঠন করেন ইতিহাসে তা **স্পেনীয় আর্মাডা** নামে খ্যাত। কেবল ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণেও ফিলিপ এলিজাবেথকে দমন করতে আগ্রহী ছিলেন। ফিলিপের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডে ডাচদের যুদ্ধে এলিজাবেথ সাহায্য করায় ফিলিপ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ফিলিপের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। নৌ-যুদ্ধে ইংলণ্ড জয়ী হয়। স্পেনের অপরাজেয় নৌ-বহর স্পেনীয় আর্মাডা ধ্বংস হয়ে যায় (১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। স্পেনের বদলে ইংলণ্ড শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়। আর্মাডা ধ্বংসের পরে স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যায়। অপরদিকে ইংলণ্ড একটি বিশাল ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে দ্বিতীয় ফিলিপের ক্যাথলিক ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু ব্যর্থ হয়নি—স্পেনের শক্তি, গৌরব এবং মর্যাদারও হানি হয়। অপরদিকে, আর্মাডার পরাজয়ের ফলে এলিজাবেথের শাসন সুরক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষা পায়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
২। মার্টিন লুথারের কথা যা জান বল।
৩। ধর্মবিপ্লবের ফলে ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার কিভাবে করা হল ?
৪। ধর্মীয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬। স্পেনের নৌবাহিনীর পরাজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ক্ষমাপত্রের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জন ওয়াইক্লিফের অবদান কি ছিল ?
৩। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জন কেলভিনের অবদান কি ছিল ?
৪। ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারে ইগনাসিয়াস লয়লার অবদান কি ?
৫। কাউন্সিল অফ ট্রেণ্টের কাজ কি ছিল ?
৬। আসবার্গের সন্ধির ফল কি ?
৭। স্পেনীয় আর্মাডার ধ্বংসের কারণ কি ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের রূপকার ছিলেন —। (খ) — কে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের শুকতারা বলা হয়। (গ) লুথার –বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। (ঘ) সুইজারল্যাণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন —। (ঙ) ইংরেজ বিশপ — ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। (চ) স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন—। (ছ) জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন –। (জ) — খ্রীষ্টাব্দে আসবার্গের সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান হয়। (ঝ) ডাচ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন –। (ঞ) ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে — সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

২। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) মার্টিন লুথার কে ছিলেন ? (খ) ক্ষমাপত্র কথাটির অর্থ কি ? (গ) খ্রীষ্ট ধর্ম কয় ভাগে বিভক্ত হয় এবং কি কি ? (ঘ) জন হাস্ কে ছিলেন ? (ঙ) জেনেভা শহরে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব কে করেন ? (চ) ইগনাসিয়াস লয়লা কে ছিলেন ? (ছ) কত খ্রীষ্টাব্দে আসবার্গের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ? (জ) উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ কে ছিলেন ? (ঝ) ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

ঘটনাপঞ্জী

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে—লুথারের রোমে আগমন।
১৫৩৪ ,, —জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা।
১৫৪৫-১৫৬৩,, —কাউন্সিল অফ ট্রেন্টের অধিবেশন বসে।
১৫৫৫ ,, —আসবার্গের সন্ধি।
১৬৪৮ ,, —ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ইউরোপে চার্চের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলনের নাম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।
২। লুথারের সমর্থকদের বলা হত প্রোটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী।
৩। যাঁরা পোপের অনুশাসন মেনে চলতেন, তাঁদের নাম হল রোমান ক্যাথলিক।
৪। লুথারের সময় জার্মান সম্রাট ছিলেন পঞ্চম চার্লস।
৫। ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন ক্যানাষার।
৬। জেসুইট সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন ইগনাসিয়াস লয়লা।
৭। ডাচ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লব

টিউডর রাজবংশ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে **বস্‌ওয়ার্থের** যুদ্ধে হেনরী টিউডর জয়ী হয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি **সপ্তম হেনরী** নামে পরিচিত। সপ্তম হেনরী ছিলেন ইংলণ্ডের টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পরে তাঁর পুত্র অষ্টম হেনরী রাজা হন। অষ্টম হেনরীর পরে তাঁর পুত্র ষষ্ঠ এডোয়ার্ড রাজা এবং পরে দুই কন্যা মেরী ও এলিজাবেথ রাণী হন।

টিউডর বংশের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংলণ্ডের এক গৌরবময় যুগ। ঐ যুগে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হতে থাকে। স্পেনের নৌ-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ইংরেজ তার সমুদ্রে আধিপত্যের সূচনা করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। স্বভাবতঃই এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের শাসন ব্যাপারে ক্ষমতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়।

রাণী এলিজাবেথ

মধ্যযুগেই ইংলণ্ডে ইংরেজ জাতির স্বাধীনতার রক্ষক পার্লামেণ্টের সাহায্যে দেশ শাসন করার রীতি, বিশেষতঃ কর বসানোর ব্যাপারে পার্লামেণ্টের সম্মতি গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়। অবশ্য মধ্যযুগে পার্লামেণ্ট যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল

না। কিন্তু ক্রমে পার্লামেন্টের গঠনের পরিবর্তন হয় এবং পার্লামেন্টের শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।
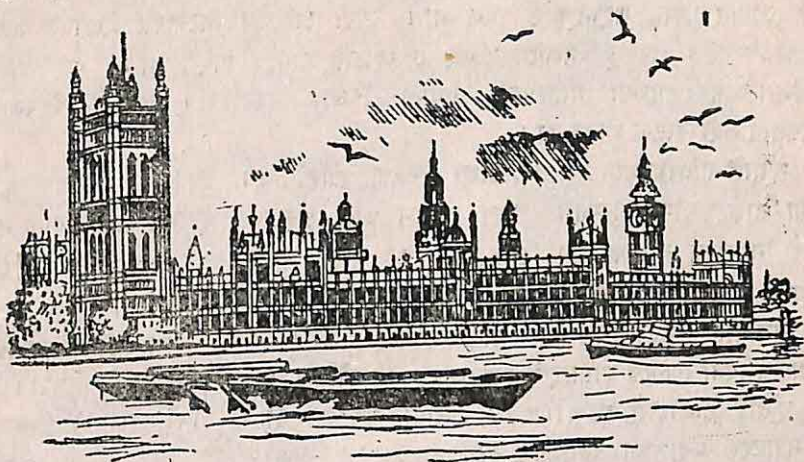
ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট

টিউডর রাজারা স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হলেও ইংলণ্ডের প্রজাদের সাথে তাঁদের বিরোধ বাধেনি। টিউডর রাজগণ সামন্তদের অত্যাচার থেকে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মুক্তি দেন এবং সামন্তদের ক্ষমতা খর্ব করেন। সেই কারণে টিউডর শাসকদের দিকে যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল। এলিজাবেথ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি প্রজাদের মনোভাব বুঝতেন এবং নিজের ইচ্ছামত চললেও প্রজাদের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলতেন।

প্রথম জেমস্

স্টুয়ার্ট রাজবংশঃ রাণী এলিজাবেথের পিসিমা ছিলেন **কুমারী মার্গারেট**। মার্গারেটের পুত্র **পঞ্চম জেমস্** ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। পঞ্চম জেমসের কন্যা ছিলেন **মেরী স্টুয়ার্ট**। তাই চিরকুমারী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর মেরী স্টুয়ার্টের পুত্র ষষ্ঠ জেমস্ই ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি রাজা হয়ে **প্রথম জেমস্** নাম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণঃ টিউডর বংশের রাজারা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত সব সময় না মানলেও প্রকাশ্যে কলহে প্রবৃত্ত হতেন না। তাঁদের

রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল। কিন্তু স্টুয়ার্ট রাজাদের এই সব গুণ ছিল না। তাঁরা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। তাঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল না। প্রজাদের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না। তাঁরা চাইতেন নিজেদের ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করতে। কিন্তু পার্লামেণ্ট এই স্বেচ্ছাচার মানতে চাইল না। এই সময় স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা রাজকার্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের ঔদ্ধত্যও ইংরেজরা সহ্য করতে পারত না।

স্টুয়ার্ট রাজারা মনে করতেন, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে তাঁরা রাজ্য শাসন করেন। রাজ্য শাসনে তাঁরা প্রজাদের মতামত মানতে বাধ্য নন এবং নিজেদের কাজের জন্য প্রজাদের কাছে দায়ী নন। তাই তাঁরা পার্লামেণ্টের মতামত উপেক্ষা করে কর বসিয়ে অর্থ আদায় করতেন। পার্লামেণ্টের দাবি হল নতুন কর বসাবার ক্ষমতা কেবলমাত্র পার্লামেণ্টেরই আছে। অনেক সময় স্টুয়ার্ট রাজারা প্রজাদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করতেন। এই নীতিও প্রজারা মেনে নিতে পারেনি।

স্টুয়ার্ট রাজাদের ধর্মনীতিতেও প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। রাণী প্রথম এলিজাবেথ ধর্মনীতিতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলতেন। কিন্তু স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস্ কেবলমাত্র ইংলণ্ডের চার্চকেই সমর্থন করতেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে প্রগতিশীল ইংরেজগণ পিউরিটান মতবাদে আগ্রহী ছিলেন। রাজার ধর্মমতে বিরক্ত হয়ে একদল ইংরেজ দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান। যাঁরা ইংলণ্ডে থেকে যান তাঁরা রাজার বিরোধী দলে যোগ দেন। রাজা প্রথম চার্লস আবার ক্যাথলিক ধর্মেও অনুরক্ত ছিলেন।

ধর্মনীতির মত স্টুয়ার্ট রাজাদের পররাষ্ট্রনীতিও প্রজাদের অসন্তোষের অন্যতম কারণ ছিল। স্টুয়ার্ট রাজারা ফ্রান্স, স্পেনের মত ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা করেন ফলে ইংরেজগণ অসন্তুষ্ট হয়। টিউডর আমলে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের যে মর্যাদা ছিল, স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে তা বিনষ্ট হয়। এদিকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট পররাষ্ট্রনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনার দাবি জানালে স্টুয়ার্ট রাজারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। পার্লামেণ্টের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলেই স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয় স্থগিত রাখতেন না হয় ভেঙ্গে দিতেন। রাজার মন্ত্রীরা বে-আইনীভাবে কাজ করলে পার্লামেণ্ট তাদের অভিযুক্ত করবার অধিকার দাবি করল।

এইভাবে পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হল। অবশ্য এই বিরোধে প্রজাদের জয় হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধ: রাজা প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস রাজা হন। প্রথম চার্লস একজন ক্যাথলিক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহ লোকে সুনজরে দেখেনি। তাছাড়া, পার্লামেণ্ট রাজার পরামর্শদাতা বাকিংহামকে পদচ্যুত করতে চাইলেন। কিন্তু রাজা এতে রাজী ছিলেন না। ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। সেজন্য রাজা দেশের লোকের কাছ থেকে জোর করে

ঋণ নিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাতেও টাকার অভাব মিটল না। শেষে বাধ্য হয়ে রাজাকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতে হল। পার্লামেণ্ট রাজার কাছে **পিটিশন্ অব্ রাইট্স** নামে এক আবেদনপত্র পেশ করল। এতে বলা হল রাজা পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়া কর আদায় করতে পারবেন না। বিনা বিচারে কোন লোককে কারারুদ্ধ করতে পারবেন না। গৃহস্থদের বাড়ীতে সৈন্য রাখতে পারবেন না। যুদ্ধের সময় ছাড়া সামরিক আইন জারী করতেও পারবেন না।

প্রথম চার্লস

রাজা তখনকার মত আবেদনপত্রের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবেদন পত্রের রচয়িতা **স্যার ইলিয়টকে** কারারুদ্ধ করে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিলেন।

এরপর এগার বছর ধরে রাজা নিজে দেশ শাসন করেছিলেন। এই সময়ে রাজা বহু অবৈধ কর ও জাহাজ কর বসিয়ে অর্থ আদায় করতে লাগলেন। **জন হ্যাম্পডেন** নামে এক ব্যবসায়ী জাহাজ কর দিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হন। বিরোধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজা দুটি আদালত বসালেন। এই দুটি আদালত অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে লাগল।

স্কটল্যাণ্ডেও রাজা প্রজাদের ধর্মে হাত দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ফলে, স্কটল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে রাজার প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের ব্যাপারে অর্থ লাভ করার জন্য রাজাকে আবার পার্লামেণ্ট ডাকতে হল। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজাকে অবৈধ কর তুলে দেওয়ার দাবি জানাল। বাধ্য হয়ে রাজা পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিলেন। মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল বলে এই পার্লামেণ্ট **শর্ট (অল্পায়ু) পার্লামেণ্ট** নামে খ্যাত।

শেষে টাকার প্রয়োজনে চার্লসকে আবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতে হল। এই পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল দীর্ঘ কুড়ি বছর—সেজন্য এর নাম **লং (দীর্ঘ) পার্লামেণ্ট**।

এই দীর্ঘ পার্লামেণ্টের সভ্যগণ রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে কৃত-সংকল্প হলেন। পার্লামেণ্টের সভ্যদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ফলে রাজায়-প্রজায় প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হল (১৬৪২ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে **গ্রেট সিভিল ওয়ার** বা **বৃহৎ গৃহযুদ্ধ** বলা হয়।

গৃহযুদ্ধের ফল ঃ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজার পরাজয়ের পালা শুরু হল। পার্লামেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিলেন **অলিভার ক্রমওয়েল**। ক্রমওয়েলের সৈন্যদল ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ; এজন্য তাদের নাম হয় **আয়রণ সাইডস্**। সাত বছর যুদ্ধের পর পার্লামেণ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করল। রাজা চার্লস পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী রাজার প্রাণদণ্ড হল।

ক্রমওয়েল এবং কমনওয়েলথ ঃ চার্লসের মৃত্যুর পর অলিভার ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করলেন। হাণ্টিংটনের এক গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মনোবল এবং চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। পার্লামেণ্টের পক্ষে যোগ দিয়ে তিনি সুদক্ষ সেনানায়কের সকল গুণের পরিচয় দেন। দেশ শাসনের ব্যাপারেও তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন। এইভাবে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং **কমনওয়েলথ** বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। এই প্রজাতন্ত্রের নায়ক হলেন **ক্রমওয়েল**। দশ বছর ধরে সামরিক শক্তির সাহায্যে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

অলিভার ক্রমওয়েল

অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **রিচার্ড ক্রমওয়েল** দেশের **প্রোটেক্টর** বা **সংরক্ষক** নিযুক্ত হলেন। কিন্তু শাসনকার্যে তাঁর কোন যোগ্যতাই ছিল না। এদিকে দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের ফলে জনসাধারণের প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। ফলে অভিজাত শ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীরা দেশে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। **দ্বিতীয় চার্লস** হলেন ইংলণ্ডের রাজা। তিনি পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধ না করে পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস্ রাজা হন। তিনি আবার স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করেন ফলে দেশে গোলযোগ আরম্ভ হয়। তিনি ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তিনি ঈশ্বরদত্ত অধিকারে বিশ্বাস করতেন এবং নিজের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। পার্লামেণ্টের প্রতিবাদে তিনি কর্ণপাত করতেন না। এর ফলে মুষ্টিমেয় ক্যাথলিক ছাড়া দেশের আর সকলে রাজার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। তখন সকল দলের নেতৃস্থানীয়রা জেমসের জামাতা হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক **উইলিয়ামকে** ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আহ্বান জানালেন। উইলিয়াম আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সসৈন্যে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয় জেমস্

দলে দলে ইংলণ্ডের অধিবাসী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। এই অবস্থায় নিরুপায় জেমস্ রাজ্য ছেড়ে ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন (১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। এই ঘটনা ইংলণ্ডের ইতিহাসে **গৌরবময় বিপ্লব** নামে পরিচিত।

গৌরবময় বিপ্লব ঃ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বিনা বাধায় ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করলেন। কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত হয়নি। এজন্য এ বিপ্লবকে 'রক্তহীন বিপ্লব' নাম দেওয়া হয়েছে।

ফলাফল ঃ গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড রাজার অত্যাচার থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেল। রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত, সে বিশ্বাস চিরতরে লোপ পেয়েছিল। স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গৌরবময় বিপ্লব পার্লামেণ্টারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্যাথলিক ধর্মমতের আর কোন প্রকার সুযোগ থাকল না। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল।

বিল্ অব্ রাইটস্ ঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিল অব্ রাইটস্ নামে এক আইন পাস করে। এই আইনকে ইংরেজ জাতি তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান ভিত্তি বলে গণ্য করে। এই আইনে বলা হয় যে (১) পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে রাজা কর ধার্য করতে পারবেন না। (২) রাজাকে দেশের আইন মেনে চলতে হবে। (৩) পার্লামেণ্টের নির্বাচনে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। (৪) পার্লামেণ্টের সদস্যরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবেন। (৫) প্রজারা রাজার নিকটে বিভিন্ন বিষয়ে দরখাস্ত করতে পারবে। (৬) বিচারকদের স্বাধীনতায় রাজা হাত দিতে পারবেন না।

এ ছাড়া **হেবিয়াস কর্পাস** আইন নামে এক আইন দ্বারা স্থির হয় যে, কোন লোককে বিনা বিচারে আটক করা যাবে না। **ট্রিয়েনিয়্যাল** নামে এক আইন দ্বারা স্থির হয় যে, তিন বছরের পর পার্লামেণ্টের নতুন নির্বাচন করতে হবে। **টলারেশন এ্যাক্ট** দ্বারা অ-প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। **এ্যাক্ট অব্ সেটেলমেণ্ট** বা উত্তরাধিকারের আইন দ্বারা স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনের উপর ক্যাথলিকদের কোন দাবি থাকবে না। এই সকল আইনের ফলে রাজশক্তি পার্লামেণ্টের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। টিউডর আমলে রাজশক্তি ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ছিল?
২। রাজা প্রথম চার্লসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিবাদের কারণ কি?
৩। অলিভার ক্রমওয়েলের কথা কি জান বল।
৪। পিটিশন্ অব্ রাইটস্ ও লং পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে কি জান বল।

৫। দ্বিতীয় জেমস্ কিভাবে রাজ্য হারালেন ?

৬। গৌরবময় বিপ্লবের বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ইংলণ্ডে টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি এবং কার আমলে ইংলণ্ডের গৌরবময় যুগের আরম্ভ হয় ?

২। স্টুয়ার্ট যুগে পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধের কারণ কি ?

৩। পিটিশন্ অব্ রাইটস্ কি ?

৪। লং পার্লামেণ্ট সম্পর্কে কি জান বল।

৫। পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হল ?

৬। বিল অব্ রাইটস্ কি ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) রাণী এলিজাবেথের পিসিমা ছিলেন কুমারী ——। (খ) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্-এর সময় থেকে ইংলণ্ডে —— রাজবংশ আরম্ভ হয়। (গ) প্রথম চার্লসের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ——। (ঘ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে পার্লামেণ্টের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন ——। (ঙ) অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র —— দেশের —— নিযুক্ত ছিলেন।

২। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) ইংলণ্ডে গৌরবময় যুগ কোন্ সময়ে দেখা দেয় ? (খ) স্যার ইলিয়ট কে ছিলেন ? (গ) জাহাজ কর-এর বিরোধিতা কে করেছিলেন ? (ঘ) ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজায়-প্রজায় প্রকাশ্য যুদ্ধকে কি বলা হয় ? (ঙ) আয়রণ সাইডস্ কাদের বলা হত ? (চ) কোন্ আইনের ফলে রাজশক্তি পার্লামেণ্টের ওপর নির্ভরশীল হয় ?

৩। **টীকা লিখ ঃ**

(ক) অধিকারের আবেদনপত্র, (খ) দীর্ঘ পার্লামেণ্ট, (গ) গৌরবময় বিপ্লব, (ঘ) হেবিয়াস কর্পাস।

৪। **শুদ্ধ বাক্যটির পাশে '√' এবং ভুলটির পাশে '×' চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) টিউডর বংশের প্রথম রাজা হলেন প্রথম জেমস্। (খ) প্রথম চার্লসের আমলে পার্লামেণ্ট রাজার নিকট 'অধিকারের আবেদন' উপস্থিত করে। (গ) দ্বিতীয় জেমসের আমলে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়। (ঘ) স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গৌরবময় বিপ্লব পার্লামেণ্টারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে দিল।

৫। নীচের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি ক্রমওয়েল সম্বন্ধে প্রযোজ্য সেগুলির পূর্বে '√' চিহ্ন এবং যেগুলি প্রযোজ্য নয় সেগুলির পূর্বে '×' চিহ্ন দাও ঃ

সুদক্ষ নেতা। উত্তম বক্তা। ক্ষীণকায় ও অতিশয় দুর্বল। প্রথম চার্লসকে যুদ্ধে পরাজিত করা। রাজশক্তি পরিচালনা করতে পার্লামেণ্টের মতামত গ্রহণ করা। কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা।

৬। বন্ধনীতে দেওয়া যুক্তিগুলির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সঙ্গত মনে কর তার সাহায্যে নিম্নলিখিত বিবৃতিটির উত্তর দাও ঃ

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয়, কারণ—

(এই বিপ্লবের ফলে প্রজারা খুব উৎফুল্ল হয়।) (এর দ্বারা প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।) (এই বিপ্লব শান্তির মধ্যে দিয়ে বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হয়।)

ঘটনাপঞ্জী

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে	প্রথম জেমসের রাজ্যলাভ।
১৬২৫ ,,	প্রথম চার্লসের রাজ্যলাভ।
১৬৪৯ ,,	প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড।
১৬৪৯-৬০ ,,	ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্রের শাসন।
১৬৬০ ,,	দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন লাভ।
১৬৮৫ ,,	দ্বিতীয় জেমসের রাজ্যলাভ।
১৬৮৮ ,,	গৌরবময় বিপ্লব।
১৬৮৮ ,,	উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধে।

২। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেণ্ট রাজার নিকট পিটিশন্ অব রাইটস্ পেশ করে।

৩। জাহাজ করের বিরোধিতা করেছিলেন জন হ্যাম্পডেন।

৪। অল্পায়ু পার্লামেণ্ট মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল।

৫। দীর্ঘ পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল দীর্ঘ কুড়ি বছর।

৬। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

৭। দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন।

৮। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব হয়েছিল।

৯। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিল্ অব্ রাইটস্ বা অধিকার সংক্রান্ত আইন দ্বারা রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

(ক) **মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার** (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)

"মোঙ্গ" থেকে 'মোঙগল' শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ নির্ভীক। আবার "মোঙগল' শব্দ থেকে 'মোগল' বা "মুঘল" শব্দটির উৎপত্তি। মধ্য-এশিয়ায় মুঘলরা "চাঘতাই-তুর্কী" নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে এরা মুঘল নামেই পরিচিত।

বাবর ঃ ইউরোপে যখন নবজাগরণ, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের যুগ চলেছে, তখন ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটরা রাজত্ব করছিলেন। ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করলেন জহিরুদ্দীন মোহম্মদ বাবর। বাবরের পূর্বপুরুষরা মধ্য-এশিয়ায় বাস করতেন। বাবরের পিতা ছিলেন দুর্ধর্ষ তৈমুরলংগের বংশধর এবং তাঁর মাতা ছিলেন মোঙগল বীর চেঙ্গীস খাঁর বংশজাত। বাবরের পিতার নাম ছিল ওমর শেখ মির্জা। মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবর তাঁর পিতৃরাজ্য মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত ফরগানার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্ঞাতিদের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি কাবুল অধিকার করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। পূর্বপুরুষ তৈমুরের রণকীর্তিই বাবরকে ভারত-জয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবর দিল্লী অধিকার করেন। এই সময়ে রাজপুতানার অন্তর্গত মেবারের বীর রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বাবরের হাতে পরাজিত হলেন। এরপর গোগরার যুদ্ধে বাবর বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ও শেরশাহঃ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হলেন। 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ ভাগ্যবান; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বহু বোঝা তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। বস্তুত, তাঁর নামকরণ ভাগ্যের পরিহাস বলেই মনে হয়। সিংহাসনে আরোহণের পরেই গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ এবং বিহারের

বাবর

হুমায়ুন

শের খাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের বিরোধ দেখা দেয়। হুমায়ুনের হাতে বাহাদুর শাহের পরাজয় ঘটে। কিন্তু পূর্ব-ভারতের শের খাঁ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে শের খাঁর নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করলেন।

শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তিনি ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শাসন-ব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার সাধন করেছিলেন। সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে তিনি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশে দায়িত্বশীল কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তিনি মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন করে রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন করেন। বাংলাদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁরই কীর্তি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দ্রুত সংবাদ পাঠাবারজন্য তিনি ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। শের শাহ জানতেন যে, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হয় না। তাই শেরশাহের নির্দেশে জমিদাররা কৃষকদের পাট্টা

প্রদান করে জমির ওপর তাদের স্বত্ব স্বীকার করে নিলেন। কৃষকরাও জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা নিয়মিত দেবার কবুল করল কবুলিয়তের মাধ্যমে।

উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজকর হিসাবে ধার্য করা হল। প্রজারা অর্থ বা শস্য দিয়ে দেয় রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উদার আদর্শ শের শাহই প্রথমে অনুসরণ করেন। সাসারামের সমাধি সৌধ আজও এই মহান সম্রাটের স্মৃতি বহন করছে।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। এই সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু সারাজীবন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে হুমায়ুন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

আকবর ঃ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তের বছর বয়সে হুমায়ুনের পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের সহচর বৈরাম খাঁ তখন আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। তখনও শের শাহের বংশধররা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হননি। আদিল শাহের সেনাপতি হিমু আগ্রা দখল করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবরের অভিভাবক ও সেনাপতি বৈরাম খাঁর কাছে হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন। এরপর পাঠান শক্তির পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনা থাকল না। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন।

আকবর

সমগ্র ভারতে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করা ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। তিনি বহু যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন, একে একে আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর তাঁর অধিকারে আসে। মালব জয় করে তিনি মধ্য-ভারতের গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করলেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। এরপর আকবর রাজপুতানার দিকে মন দিলেন। সন্ধি ও বিবাহবন্ধন স্থাপন করে তিনি একে একে রাজপুত রাজাদের বশীভূত করলেন। অম্বরের রাজা বিহারীমল্ল, পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের আনুগত্য স্বীকার করলেন। মেবারের রাণা উদয় সিংহই শুধু আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন। প্রায় চার মাস অবরোধের পর চিতোর অধিকৃত হল। উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ সারা জীবন ধরে আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে

মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সেলিমের হাতে পরাজিত হলেও রাণা প্রতাপ সিংহ ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

উত্তর-ভারত বিজয় সমাপ্ত হবার পর আকবর দক্ষিণ-ভারতের খান্দেশ, মেবার ও আহম্মদনগর জয় করেন।
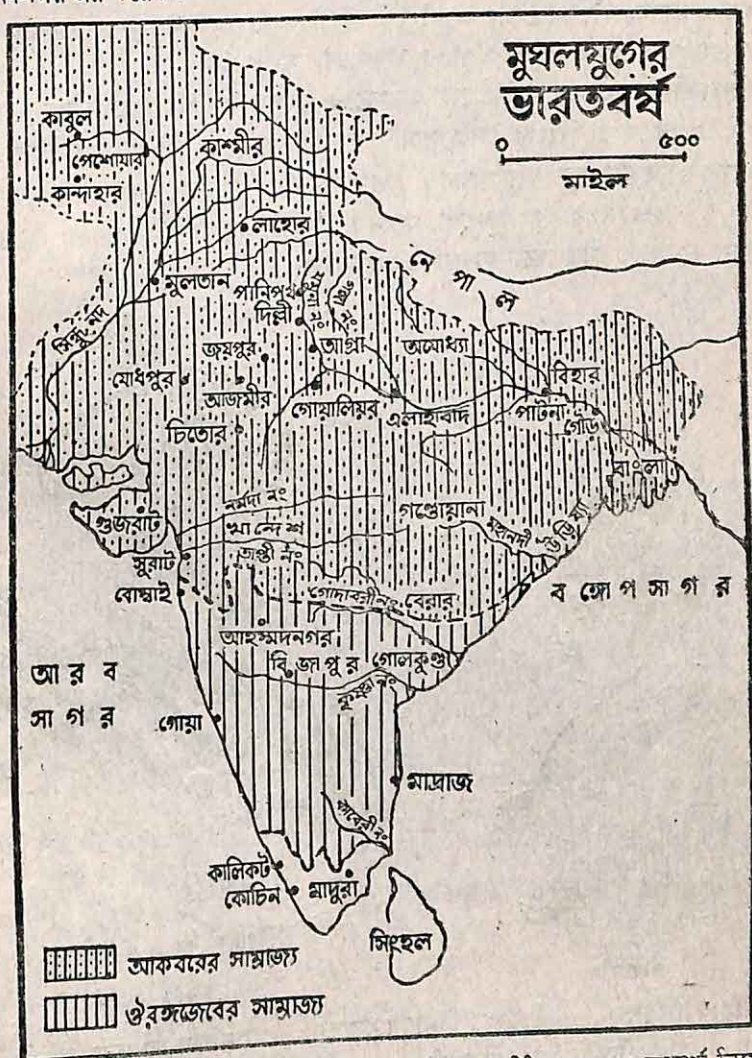
আকবর 'হিন্দু' ও 'মুসলমান প্রজাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শ নিয়ে এক উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি এক পরম উদার নীতি গ্রহণ করলেন। সম্রাটের আগ্রহে ফতেপুর সিক্রীর 'ইবাদতখানা' নামে একটি প্রাসাদে হিন্দু,

মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতরা মিলিত হয়ে সম্রাটের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক মহাধর্মের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য তিনি **দীন-ই-ইলাহি** নামে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন।

আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করতেন। আবুল ফজল, ফৈজী, তানসেন, বীরবল প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরা তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

জাহাঙ্গীর ঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনিও রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে মুঘল সেনাপতিরা বাংলাদেশ, মেবার ও আহম্মদনগর জয় সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সময়ই পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস মুঘলদের কাছ থেকে কান্দাহার কেড়ে নেন।

জাহাঙ্গীর

শাহ্‌জাহান

জাহাঙ্গীর শিক্ষা ও শিল্পের সমাদর করতেন। ন্যায়বিচারের জন্য তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গীর ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয়। শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব কার্যতঃ তাঁর পত্নী নূরজাহানের ওপরই ন্যস্ত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন।

শাহজাহান ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহজাহান সম্রাট হন। সিংহাসন লাভের পর প্রথমেই তিনি রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি কান্দাহার জয়ের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগই শাহজাহানকে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করেছে। শাহজাহান অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মুকুটে শোভা পেত জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরক। পৃথিবীবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন তাঁর আমলেই তৈরী হয়েছিল। আগ্রায় সম্রাটের প্রিয়তম পত্নী মমতাজমহলের সমাধি 'তাজমহল' এক অপূর্ব সৃষ্টি। অপরিমিত অর্থ ও বহু বছরের চেষ্টায় এই তাজমহল তৈরী হয়েছিল। দিল্লী ও আগ্রার দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শিসমহল, মোতি মসজিদ প্রভৃতিও তাঁর রাজত্বকালেই নির্মিত
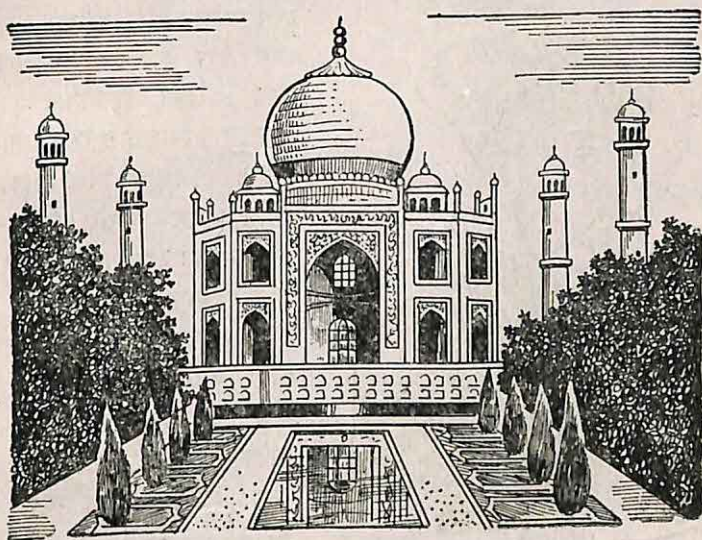
তাজমহল

হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা শাহজাহানের রাজত্বকালে সুখের ছিল না। বস্তুত, লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোষণের বিনিময়ে গড়ে উঠেছিল এই সব প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ।

ঔরঙ্গজেব ঃ শাহজাহানের জীবিতাবস্থায় তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। ভ্রাতাদের কাউকে হত্যা, কাউকে বিতাড়িত করে এবং শেষে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে ঔরঙ্গজেব 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসলেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে। সেনাপতি মীরজুমলার পরাক্রমে কুচবিহার এবং

আসামে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটিও তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করেন।

মুঘল বাদশাহদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের মত পরিশ্রমী, ধর্মনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ বাদশাহ আর দেখা যায়নি। তিনি ফকিরের মত সরল জীবন যাপন করতেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন জিন্দাপীর বা জীবিত পীর।

আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। পবিত্র কোরাণের প্রত্যেকটি আদেশ তিনি মেনে চলতেন। তাঁর আদেশে রাজসভায় নাচ, গান, আমোদ-আহ্লাদ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তিনি হিন্দুদের দেব মন্দিরগুলি ধ্বংস করার আদেশ দেন এবং তাদের ওপর আবার নতুন করে জিজিয়া কর বসান। এর ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজপুত, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সারাজীবন ধরে এই সব বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টায় সম্রাটকে ব্যস্ত থাকতে হয়। শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁকে উত্তর ভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পরবর্তীকালের অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর ফলে একদিকে সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে যুদ্ধের খরচ চালাতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনও ত্বরান্বিত হয়েছে।

ঔরঙ্গজেব

মুঘল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ মুঘল শাসনব্যবস্থায় বাদশাহ স্বয়ং ছিলেন সর্বপ্রধান। সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে যেতে পারেননি, সে কৃতিত্ব আকবরের। তিনি বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে একটি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তী সম্রাটরা শাসনব্যবস্থার সামান্য রদবদল করেছিলেন, কিন্তু কাঠামো ছিল অপরিবর্তিত।

মুঘলশাসনপ্রণালীর সঙ্গে বর্তমান ভারতের শাসনপ্রণালীর কিছু সাদৃশ্য আছে।

এখন যেমন কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশ আছে, মুঘল সাম্রাজ্যও তেমনি বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত ছিল। এখন যেমন প্রত্যেক প্রদেশে একজন রাজ্যপাল আছেন, মুঘল সাম্রাজ্যেও তেমনি প্রত্যেক সুবায় এক-একজন সুবাদার নিযুক্ত হতেন। শাসনকার্যের জন্য সুবাদার সম্রাটের কাছে দায়ী থাকতেন। এখন যেমন প্রত্যেকটি প্রদেশ কতকগুলি জেলায় বিভক্ত, তখনও প্রত্যেকটি সুবা কয়েকটি সরকারে বিভক্ত ছিল। সরকার-এর শাসনকর্তাকে ফৌজদার বলা হত। কোতোয়াল উপাধিধারী কর্মচারীরা বড় বড় শহরে শান্তিরক্ষা করতেন। বিচার-বিভাগের কর্তা ছিলেন কাজী। দেওয়ান নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত। এখনকার মত জমি জরিপ করে খাজনা ধরা হত। আকবরের আমলে তোডরমল সমস্ত জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন।

আবার অনেক বিষয়ে মুঘল আমলের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এখনকার শাসনব্যবস্থার পার্থক্য আছে। এখন শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারের স্থান নেই, দেশের মানুষের মত অনুযায়ী মন্ত্রীদের চলতে হয়। মুঘল আমলে সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকলেও আসলে সম্রাটই তাঁর ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। তখন পল্লী অঞ্চলে বিচারের জন্য পঞ্চায়েত প্রথা ছিল। মুঘল আমলে সৈন্যদলের নায়কদের নাম ছিল 'মনসবদার'। আগে বড় বড় রাজকর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হত। এতে রাজস্বের খুব ক্ষতি হত। আবার অনেক সময় জায়গীরদাররা খুব শক্তিশালী হয়ে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করত। জায়গীর প্রথার কুফল দেখে আকবর এই প্রথা তুলে দিলেন এবং তার পরিবর্তে মনসবদার প্রথার প্রচলন করলেন। একজন মনসবদারকে দশজন থেকে আরম্ভ করে দশ হাজার পর্যন্ত সৈন্যের আধিপত্য দেওয়া হত। দশ থেকে দশহাজারী মনসবদার আপন আপন পদমর্যাদা অনুসারে রাজকোষ থেকে বেতন পেতেন।

মুঘল যুগের সংস্কৃতি ঃ মুঘল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। সম্রাটরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একই রকম সমাদর করতেন। এই সময় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণে এক উচ্চতর সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। সম্রাট আকবরের উদার নীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ চলতে থাকায়, উভয় সমাজের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি উভয় সমাজে প্রবেশ করেছিল। হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিখে সম্রাটের দরবারে চাকরি নিতেন। অনেক মুসলমান কবি আবার হিন্দী ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন। এইভাবে দুই ধর্মের লোকের অবাধ মেলামেশার ফলে ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, আচার-ব্যবহারে দুই ভাবধারার মিলন হয়েছে।

মুঘল যুগে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। আকবরের আমলের লাল কেল্লা, বুলন্দ দরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রী এবং সিকান্দ্রায় সম্রাটের পরিকল্পিত নিজের

সমাধি সৌধ; শাহজাহানের সময়ের আগ্রা দুর্গ, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর দুর্গের দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, জাম-ই-মসজিদ প্রভৃতি মুঘল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি মন্দিরের প্রেরণা এসেছে বৌদ্ধ বিহারের গঠন থেকে। আগ্রায় জাহাঙ্গীর ইতিমদ-উদ্দৌলার যে সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন তাতেও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই যুগের চিত্রশিল্পেও রাজপুত এবং পারস্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বাবর ও হুমায়ুন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে ছবি আঁকতেন। ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরকে একটি সুন্দর ছবি দিয়েছিলেন। সম্রাটের চিত্রকররা সেই ছবির এমন নিখুঁত অনুকরণ করেছিলেন যে, কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল তা ধরা শক্ত ছিল।

এই সময় সঙ্গীতশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর করতেন। আকবরের রাজসভার অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বিখ্যাত গায়ক তানসেন। মালবরাজ বজবাহাদুর হিন্দী সঙ্গীত ও সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁর গভীর পারদর্শিতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

মুঘল বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় পারসিক ও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' এই যুগের অমূল্য সম্পদ। হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাস, বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, মারাঠা সাহিত্যে রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি কবি ও লেখকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আবুল ফজল, বদায়ুনী, কাফি খাঁ প্রভৃতির লেখা ইতিহাস ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে মুঘল যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। বার্ণিয়ে বলেছেন, মুঘল রাজসভার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক ছিল অতুলনীয়। ভারতের বড় বড় শহরগুলি ইউরোপের কোন শহর থেকে মোটেই ছোট ছিল না। বহির্বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হওয়ায় দেশে ধনরত্নের অভাব ছিল না। ঢাকার মসলিন এবং বাংলার রেশমের যথেষ্ট চাহিদা ছিল ইউরোপে। নীল, রেশম, সুতীবস্ত্র, মসলিন, আফিং ছিল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। চীনামাটির বাসন, ঘোড়া, মণিমুক্তা ছিল প্রধান আমদানি দ্রব্য।

মুঘল রাজত্বকালে ভারতীয় সমাজ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং জনসাধারণ। রাজপরিবারের বিলাসিতা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, তাঁরা অলসভাবে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতেন। রাজকর্মচারীদের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। এদেশের শাসনকর্তা ও কর্মচারীরা সাধারণতঃ প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী হতেন। মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর

মানুষরা খুব পরিশ্রমী এবং সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। জনসাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শাসকদের অত্যাচারে কৃষকরা দুবেলা দু'মুঠো আহারও জোটাতে পারত না। শ্রমিক ও মজুরদের আহার ও বাসস্থানের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। শাহজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ছিল খুব বেশী। দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা বিলাসিতায় দিন কাটাত। দেশের অধিকাংশ সম্পদ ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির অধিকারে।

বৈদেশিক বিবরণ ঃ মুঘল যুগে অনেক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে আসেন। তাঁদের বিবরণী থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ-ব্যবস্থার বহু তথ্য জানা যায়। আকবরের রাজত্বকালে **র‍্যালফ ফিচ** নামে জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। তাঁর মতে আগ্রা ও ফতেপুরসিক্রি শহর দুটি তৎকালীন লণ্ডন অপেক্ষা বড় ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যে সকল পর্যটক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে **উইলিয়ম হকিন্স, স্যার টমাস রো** এবং **ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট** উল্লেখযোগ্য। টমাস রো জাহাঙ্গীরের আমলে মনসবদারী প্রথার অবস্থা সম্বন্ধে লেখেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতে আসেন। পেলসার্ট ওলন্দাজ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজ-কর্মচারীদের দ্বারা কৃষকগণ অত্যাচারিত হত। **টাভার্নিয়ে** নামে একজন ফরাসী বণিক এবং **বার্ণিয়ে** নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইটালীয় পর্যটক **মানুচি** ভারতে আসেন। **বুটান ও কার্টরাইট** নামে দুজন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই সকল বিদেশীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ভারতের সাথে বিভিন্ন ইউরোপীয় সভ্য জাতির ব্যবসায়িক আদান-প্রদান চলত।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা শাহজাহানের আমলে শুরু হয় এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের বেশীর ভাগ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে কেটেছে। দক্ষিণ ভারতের মারাঠাদের সঙ্গে তাঁকে প্রায় পঁচিশ বছর যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। এই সুযোগে উত্তর ভারতের প্রাদেশিক শাসকরা ধীরে ধীরে স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিরোধী নীতি সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রবলভাবে আঘাত করল। রাজপুত, শিখ, জাঠ ও মারাঠা প্রভৃতি জাতি মাথা তুলে দাঁড়াল। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সম্রাটকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হল। ফলে, একদিকে যেমন সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অন্যদিকে যুদ্ধের খরচ চালাতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের পতন আরও ত্বরান্বিত হল। ব্যর্থতার চরম গ্লানি নিয়ে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব মারা যান।

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন দুর্বল ও আরামপ্রিয়। বিশাল রাজ্যের

শাসন করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। তাঁদের সময়ে আমীর ওমরাহরা প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। মুঘল যুগে কোন শক্তিশালী অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। সম্রাট দুর্বল হলে অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু সে সময় কোন বিকল্প শাসকশ্রেণী গড়ে ওঠেনি।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীঃ) মুঘল সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুঘল সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ, জাহান্দার শাহ ও ফারুকশিয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। এঁদের অত্যাচার, ব্যভিচার ও অকর্মণ্যতার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। পরবর্তী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগে পারস্য-অধিপতি **নাদির শাহ** ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানরাজ **আহম্মদ শাহ আবদালীর** আক্রমণেও মুঘল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হল। মুঘল সম্রাট আহম্মদ শাহ ও দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হল। এর মধ্যেই বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আইনত বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে আলিবর্দি খাঁর সময় পর্যন্ত বাংলার নবাবরা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর (১৭৫৬ খ্রীঃ) সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার নবাব হন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) সিরাজের পরাজয় ঘটলে বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

নাদির শাহ

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

সূচনা ঃ মুঘল যুগের একটি বিশেষ ঘটনা ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্য দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতবর্ষ, পৃথিবীর দুই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে

আবদ্ধ হয়। গ্রীক ঐতিহাসিক **হেরোডোটাস্** তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ভারত বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গ্রীক দূত **মেগাস্থিনিস** মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের "Periplus of the Erithrian Sea" (পেরিপ্লাস অব্ দি এরিথ্রিয়ান সি) নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষ ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মধ্যযুগে আরবগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বাণিজ্য পণ্য নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বিক্রয় করত। আরবদের হাতে প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য চলে যাওয়ার পূর্বেই ইউরোপীয় বণিকগণ জলপথে ও স্থলপথে ভারতে আসত। তখন থেকেই সরাসরিভাবে জলপথে ভারতে আসার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে দেখা গেল।

পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অল্প পূর্বে পর্তুগীজগণ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিল। ক্রমশঃ পর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বোম্বাই এবং বাংলাদেশের হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে।

পর্তুগীজদের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার এবং ফরাসী বণিকরাও ভারতে বাণিজ্য করতে এল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংরেজরা **ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** প্রতিষ্ঠা করে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হকিন্স ও টমাস রো ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্যিক সুযোগ প্রার্থনা করে ভারতে আসেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে **জব চার্ণক** সম্রাটের অনুমতি নিয়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। জন সুরমান মুঘল সম্রাটের এক নির্দেশে বাণিজ্য-সংক্রান্ত সুবিধা লাভ করেন।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে **ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** গঠিত হয়েছিল। ভারতে বাণিজ্য করতে এসে প্রথমে পর্তুগীজদের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তারা বাংলাদেশের চুঁচুড়া অধিকার করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করে।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে তাঁর মন্ত্রী কোলবার্টের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে একটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। সুরাটে সর্বপ্রথম এদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমে, মসুলিপত্তম, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণ ভিন্ন দিনেমার, অস্ট্রিয়ান, সুইডিস বণিকগণও ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল। বাংলাদেশে শ্রীরামপুরে দিনেমার বণিকগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তারা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে।

মুঘল রাজত্বের পতনের যুগে ভারতবর্ষের রাজত্ব নিয়ে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের সুরক্ষিত বাণিজ্য কুঠি ছিল **ফোর্ট সেণ্ট জর্জ**; আর ফরাসীদের কুঠি ছিল **পাণ্ডিচেরী**। দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসন একপ্রকার বিলুপ্ত হয়েছিল। কর্ণাটকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসী জাতি ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে। ভাগ্যদেবী ইংরেজদের সহায়ক হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। সে সময় বাংলাদেশে ফরাসীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) ইংরেজদের পক্ষের সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ সিরাজকে পরাস্ত করেন ও ফরাসীদের চন্দননগরের কুঠি দখল করে নেন। এইভাবে ভারতে ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজ শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে।

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার: মারাঠা শক্তির উত্থান মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। একনাথ, তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিতের ভক্তিবাদ মারাঠা জাতির মধ্যে এক নতুন উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। তারই ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে এক নতুন চেতনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে ভারতবর্ষে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে মারাঠা জাতি প্রবল হয়ে ওঠে। সাতপুরা, বিন্ধ্য ও সহ্যাদ্রী পর্বতমালাবেষ্টিত মালব ও কংকনের অনুর্বর মরুভূমি মারাঠাদের বাসভূমি ছিল। রণকুশল এই জাতি দীর্ঘদিন ধরে বিজয়নগর-বিজাপুর রাজশক্তির অধীনে সৈনিকের কাজ করে এসেছে। ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দুর্ধর্ষ সৈনিক জাতি এক ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ভারতে নবজাগ্রত মারাঠা শক্তির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন **শিবাজী**। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ) শিবাজী পুনা জেলার অন্তর্গত শিবনের গিরি দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহজী প্রথমে আহম্মদনগরে ও পরে বিজাপুর সুলতানের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। শিবাজীর বাল্য-জীবন তাঁর মাতা জিজাবাঈ ও দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে অতিবাহিত হয়েছিল। অল্প বয়সেই শিবাজী স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মাওয়ালীদের নিয়ে একটি সুশিক্ষিত সেনাদল গঠন করেন এবং বিজাপুরের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খাঁকে পাঠালেন। শিবাজী কূটকৌশলে আফজলকে পরাজিত ও নিহত করেন। শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে দমন করতে সক্ষম হলেন না। শিবাজী আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। কিন্তু

মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ শিবাজীকে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। শিবাজী আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বীকৃত হলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করলে শিবাজী কৌশলে পলায়ন করেন।

শিবাজী দেশে ফিরে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। মুঘলদের যে সব জায়গা তিনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলি পুনরায় উদ্ধার করলেন। **ছত্রপতি** উপাধি ধারণ করে শিবাজী রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন কর আদায় করে তিনি রাজ্যের আর্থিক উন্নতি সাধন করেন। শিবাজী বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। শিবাজীর চেষ্টায় মারাঠাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পরেও মারাঠারা এক সংঘবদ্ধ জাতিরূপে স্বীকৃত ছিল। ঔরঙ্গজেবের পক্ষে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি।

ছত্রপতি শিবাজী

শিবাজী এক উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিবাজীকে শাসন-কার্যে সাহায্য করার জন্য **অষ্ট প্রধান** বা আটজন মন্ত্রীর এক পরিষদ ছিল। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত পেশোয়া। শিবাজী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে চৌথ বা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ অথবা সরদেশমুখী বা রাজস্বের এক-দশমাংশ আদায় করতেন। শিবাজীর সৈন্যবাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহী সৈন্য ছিল আবার দুইভাগে বিভক্ত বর্গী ও শিলাদার।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র **শম্ভুজী** মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র দ্বিতীয় আকবরকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। শম্ভুজী মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে বন্দী হন এবং বন্দীদশায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। মুঘল বাহিনী মারাঠাদের রাজধানী রায়গড় অধিকার করার সময়ে শম্ভুজীর শিশু পুত্র **শাহু** ও পরিবারবর্গ মুঘলদের হাতে বন্দী হয়। কিন্তু শিবাজীর অন্যতম পুত্র

রাজারাম কর্ণাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। রাজারাম সাতারায় রাজধানী স্থাপন করে মুঘলগণকে বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। ঔরঙ্গজেব মারাঠাশক্তিকে দমন করতে সক্ষম হলেন না। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ শিশুপুত্র তৃতীয়
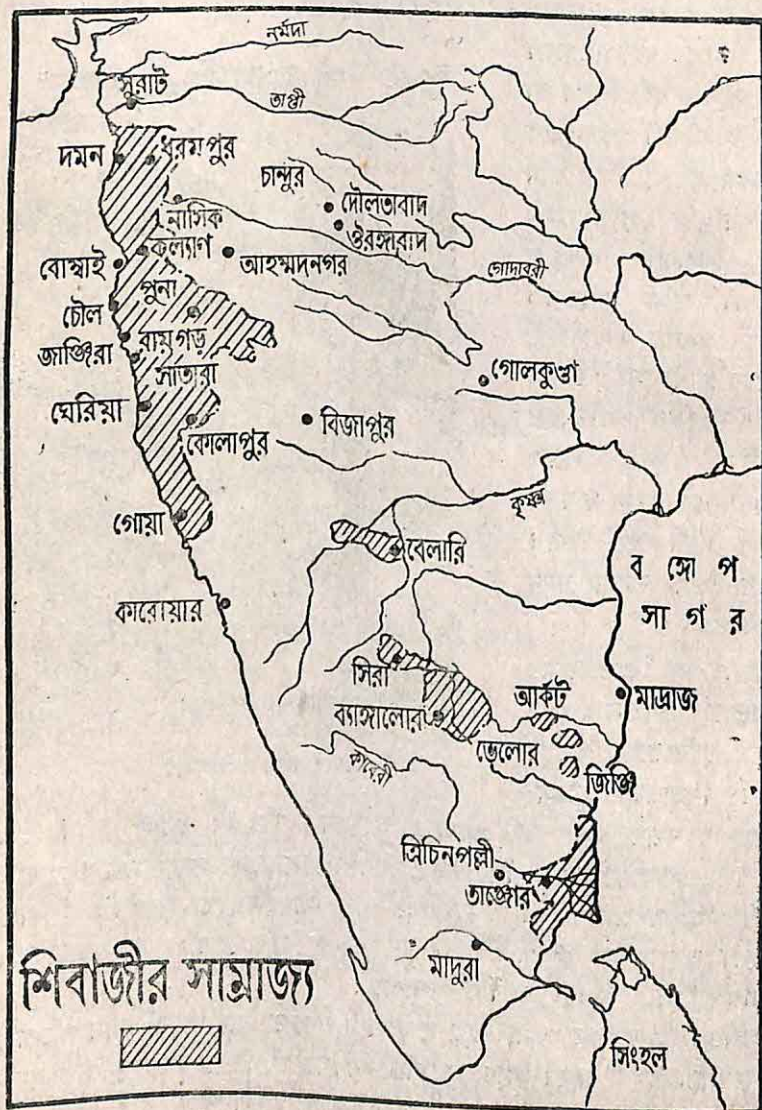
শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আজম শাহ শিবাজীর পৌত্র শাহু বা দ্বিতীয়

শিবাজীকে মুক্ত করে দেন। শাহুর প্রত্যাবর্তনে মারাঠা জাতির মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হবে এই আশায় আজম শাহ শাহুকে মুক্তি দেন। শাহু মুক্তিলাভ করে সিংহাসন দাবী করলেন। কিন্তু তারাবাঈ তাঁর পুত্র তৃতীয় শিবাজীর অভিভাবকরূপে শাহুর দাবী অগ্রাহ্য করলেন। শাহু সসৈন্যে সাতারায় প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। রাজারামের অপর পত্নী রাজাবাঈ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীকে কোলাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শেষ পর্যন্ত বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে শাহু মারাঠা রাজ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

বালাজী বিশ্বনাথঃ শাহুর প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ পেশোয়া নিযুক্ত হলেন বালাজী বিশ্বনাথ। শাহুর শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতা তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন। বালাজী বিশ্বনাথের পর থেকে পেশোয়ার পদ বংশানুক্রমিক হয়ে গেল। তিনিই সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লীর বাদশাহ ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যে ছয়টি সুবার কর আদায়ের অধিকার লাভ করেন ও উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন।

প্রথম বাজীরাওঃ বালাজী বিশ্বনাথের পর পেশোয়া পদ লাভ করেন তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও (১৭২০ খ্রীঃ)। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা এবং পিতার মত বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তিনি উত্তর ভারতে মারাঠা প্রভুত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন। হিন্দুদের সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি 'হিন্দুপাদ পাদশাহী' অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের আদর্শ প্রচার করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডের কিছু অংশ দখল করেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। এই সময় মুঘল সম্রাট হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। বাজীরাও নিজামকে ভূপালের নিকট পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। ফলে মালব এবং চম্বল ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে মারাঠা অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এরপর সলসেট ও বেসিন পেশোয়ার দখলে এল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাজীরাও-এর হঠাৎ মৃত্যু হয়।

বালাজী বাজীরাওঃ প্রথম বাজীরাও-এর পর পেশোয়া হন বালাজী বাজীরাও। বালাজী বাজীরাও পিতার হিন্দুপাদ পাদশাহী আদর্শ ত্যাগ করে মারাঠা সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ওপর অত্যাচার করতে লাগল। এর ফলে মারাঠারা হিন্দুদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হল। তিনি সৈন্যবাহিনীতে অনেক অ-মারাঠী ভাড়া করা সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লীতে মারাঠা প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী মারাঠাদের পরাজিত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। এদিকে পেশোয়াও পাঞ্জাব পুনরধিকার করার জন্য তাঁর পুত্র বিশ্বাস রাও এবং সদাশিব রাও-এর নেতৃত্বের

এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে দুপক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয় ঘটে। বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাও প্রভৃতি বড় বড় মারাঠা নায়ক ও পেশোয়ার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে বালাজী বাজীরাও ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের শক্তি ও মর্যাদা অনেকাংশে নষ্ট হয়। ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। পাঞ্জাবে শিখ জাতির উত্থানও সম্ভব হয়েছিল এর ফলেই। অবশ্য এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি খর্ব হলেও একেবারে বিনষ্ট হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই পেশোয়া প্রথম মাধবরাও, মহাদজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে মারাঠারা তাদের লুপ্ত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিল।

শিখ শক্তির অভ্যুদয়ঃ শিখধর্মের প্রবর্তক **নানকের** সময় থেকে ভারতের ইতিহাসে শিখ জাতির আবির্ভাব আরম্ভ হয়। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে ভারতের নানা স্থান পর্যটন করেন। ধর্মসংস্কারক হিসাবে তিনি ছিলেন বর্ণভেদের বিরোধী ও একেশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁর মতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। নানক তাঁর শিষ্যগণকে মিথ্যা ভাষণ, কপটতা ও আত্মসুখ পরিহার করার উপদেশ দিতেন। তাঁর অনুচরবর্গ শিখ বা শিষ্য নামে পরিচিত ছিল। তিনি ছিলেন শিখদের প্রথম গুরু।

নানকের পর গুরু অঙ্গদ শিখধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল নানকের বাণী লিপিবদ্ধ করা এবং গুরুমুখী ভাষার প্রবর্তন করা। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অঙ্গদের মৃত্যু হলে গুরু **অমরদাসের** আবির্ভাব হয়। তাঁর সময়ে শিখধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি সতীদাহ প্রথার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অমরদাসের মৃত্যু হলে গুরু **রামদাসের** আবির্ভাব হয়। শিখধর্মের প্রধান কেন্দ্র অমৃতসর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গুরু রামদাসের নাম জড়িত। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনি সম্রাটের নিকট থেকে একখণ্ড জমি পেয়েছিলেন। ঐ জমির উপর তিনি **অমৃতসর** নামে একটি পুষ্করিণী খনন করেছিলেন।

গুরু রামদাসের পর গুরু **অর্জুন** শিখধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম শিখদের ধর্মগ্রন্থ **গ্রন্থসাহেব** সঙ্কলন করেন। তিনি অনুচরবর্গের স্বেচ্ছাদানকে একটি নিয়মিত কর হিসেবে রূপান্তরিত করেন। যাঁরা এই কর আদায় করতেন তাঁরা **মসন্দ** নামে অভিহিত হতেন। তিনি শিখগণকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করেন।

এই সময় থেকে শিখগণ ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে আশ্রয় ও আশীর্বাদ করার অপরাধে গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড হয়। তার ফলে শিখ জাতি জাহাঙ্গীর তথা মুঘলদের চিরশত্রুতে পরিণত হল। আত্মরক্ষার জন্য শিখগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করে।

গুরু অর্জুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **হরগোবিন্দ** গুরুপদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর সময় থেকে শিখজাতি সামরিক সংগঠনে মনোযোগী হয়। তিনি প্রথম থেকেই মুঘলদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমলে পুনরায় শিখদের সঙ্গে মুঘলদের শত্রুতা আরম্ভ হলে গুরু হরগোবিন্দ বিদ্রোহী হলেন। **অমৃতসর ও কর্তারপুরের** যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হরগোবিন্দ পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন।

গুরু **হররায়** ছিলেন হরগোবিন্দের পৌত্র। শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি দারার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই অপরাধের জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। গুরু **হরিকিষণের** আমলে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

গুরু তেগবাহাদুর ছিলেন শিখদের নবম গুরু। ঔরঙ্গজেবের গোঁড়ামি ও হিন্দুর উপর অত্যাচারের তিনি প্রতিবাদ করেন। তাঁকে বন্দী করে দিল্লী আনা হল। শোনা যায়, তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বলা হলে তেগবাহাদুর তা অস্বীকার করেন এবং তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর ফলে শিখদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু **গোবিন্দের** নেতৃত্বে শিখরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠল। নবদীক্ষিত শিখদের নাম হল **খালসা**। খালসা সংগঠন করে গুরু গোবিন্দ শিখ জাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত করলেন। প্রত্যেক শিখকে "সিং" অথবা সিংহ উপাধি নিতে হত। এ ছাড়া পঞ্চ 'ক' অর্থাৎ কেশ, কঙ্গা, কৃপাণ, কচ্ছ ও কড়া এ পাঁচটি জিনিস রাখা বাধ্যতামূলক করা হল। ঔরঙ্গজেবকে শিখদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

রণজিৎ সিং

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের পর তাঁর পুত্র সম্রাট বাহাদুর শাহের সঙ্গে গোবিন্দ সিংহের মিত্রতা স্থাপিত হয়। সম্রাটের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য যাওয়ার পথে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক পাঠান আততায়ীর হাতে গোবিন্দ সিংহ নিহত হন।

মুঘলদের অত্যাচারের ফলে শিখ সম্প্রদায় একটি দুর্ধর্ষ রণনিপুণ ও সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর বান্দা শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হন। সম্রাট ফারুকশিয়ারের আমলে বান্দা সরহিন্দ আক্রমণ করলেন; শেষে পরাজিত হয়ে সম্রাটের আদেশে নিহত হন। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণের সুযোগে শিখগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে অধিকার বিস্তার করতে থাকে।

আহম্মদ শাহ আবদালীর পতনের পর শিখগণ একাধিক নেতার অধীনে সমগ্র পাঞ্জাব বারোটি **মিস্‌ল** বা **অঞ্চলে** বিভক্ত করল। এই রাজ্যখণ্ডগুলি সম্মিলিত করে **পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ** একটি পরাক্রান্ত শিখরাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন যেমন বীর যোদ্ধা তেমনি সংগঠনী ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক। শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, কিন্তু ইংরেজদের বাধাদানের ফলে তা সম্ভব হয়নি। শাসনকার্যে ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করে এবং ধর্মবিষয়ে উদারনীতি গ্রহণ করে তিনি মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

অনুশীলনী

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হল কিরূপে?

২। শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? তাঁর ধর্মমত কি ছিল?

৪। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। শাসক হিসেবে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর।

৬। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

৭। মুঘল যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। বৈদেশিক বিবরণ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

২। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

৩। আকবরের দীন-ই-ইলাহি সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৪। ঔরঙ্গজেবকে জিন্দাপীর বা জীবিত পীর বলা হয় কেন ?

৫। মুঘল যুগে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র বলতে কি বোঝ ?

৬। টাভার্নিয়ে ও বার্নিয়ে-এর বর্ণনায় মুঘল যুগে কি ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা কে করেছিলেন ? (খ) কবুলিয়ত ও পাট্টা কার আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল ? (গ) ব্রহ্মজিৎ গৌড় কে ছিলেন ? (ঘ) বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ? (ঙ) দীন-ই-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন ? (চ) জাহাঙ্গীরের আমলে কোন্ ইংরেজ দূত ভারতে আসেন ? (ছ) বিশ্ববিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন কোন্ সম্রাট পারস্য দেশে নিয়ে যান ? (জ) কোন্ মুঘল সম্রাটকে জিন্দাপীর বলা হত ? (ঝ) মনসবদার কাদের বলা হত ? (ঞ) আইন-ই-আকবরী ও আকবর-নামা গ্রন্থ দু'খানি কোন্ কবির লেখা ? (ট) র‍্যালফ ফিচ কোন্ সম্রাটের আমলে ভারতে আসেন ? (ঠ) পেলসার্ট কে ছিলেন ?

২। **সঠিক উত্তরটি খুঁজে (√) চিহ্নিত কর ঃ**

(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়—(খ্রীঃ ১৫২৬, ১৫৫৬, ১৭৬১)

(খ) কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন—(হিমু, শেরশাহ, জাহাঙ্গীর)

(গ) টোডরমল কোন্ মুঘল সম্রাটের সমসাময়িক—
(হুমায়ুন, শাহ্‌জাহান, আকবর)

(ঙ) তাজমহল কোন্ মুঘল সম্রাটের—(বাবর, শাহ্‌জাহান, আকবর)

ঘটনাপঞ্জী

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে—বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন।
১৫৫৩ „ —আকবরের রাজ্যলাভ।
১৫৬০ „ —জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ।
১৬২৮ „ —শাহ্‌জাহানের রাজ্যলাভ।
১৬৫৮ „ —ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনলাভ।
১৭০৭ „ —ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।
১৭৩৯ „ —নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠন।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল।

২। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধ হয়েছিল বাবর ও সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে।
৩। কবুলিয়ত, পাট্টা ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শেরশাহের কীর্তি।
৪। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল আকবর ও হিমুর সঙ্গে।
৫। দীন-ই-ইলাহী ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন আকবর।
৬। ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিলেন।
৭। মুসলমানদের কাছে ঔরঙ্গজেব জিন্দাপীর নামে পরিচিত ছিলেন।
৮। মুঘল আমলে সৈন্যদলের নায়কদের নাম ছিল মনসবদার।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে পর্তুগীজদের আগমন ও তাদের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কি জান?
২। ভারতে ইংরেজদের আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কলিকাতা নগরীর পত্তন কিভাবে হয়েছিল?
৩। শিবাজীর জীবনী ও কার্যকলাপ পর্যালোচনা কর।
৪। শিখশক্তির অভ্যুত্থানের মূলে কি কি কারণ ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের কারণ কি?
২। কলিকাতা মহানগরীর পত্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?
৪। ঔরঙ্গজেবের আমলে শিখ ও মুঘলদের সংঘর্ষের কারণ কি?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) বাংলায় পর্তুগীজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল—। (খ) ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে—কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। (গ) ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর মন্ত্রীর নাম ছিল—। (ঘ) বাংলায় ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল—। (ঙ) শিবাজী — খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল — ও মাতার নাম —। (চ) পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —। (ছ) সর্বশেষ পেশোয়া ছিলেন —। (জ) —পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। (ঝ) গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে নবদীক্ষিত শিখদের নাম হল—। (ঞ) সমগ্র পাঞ্জাব বারোটি—এ বিভক্ত হল।

২। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) কলিকাতা নগরীর পত্তন কে করেছিলেন? (খ) কোলবার্ট কে ছিলেন? (গ) দাদাজী কোণ্ডদেব কে ছিলেন? (ঘ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে

হয়েছিল ? (ঙ) শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? (চ) মনসবদার কাদের বলা হত ? (ছ) গুরু তেগবাহাদুরের পর শিখদের ধর্মগুরু কে ছিলেন ?

৩। সঠিক উত্তরটি রেখে অন্যগুলি বাদ দাও ঃ

(ক) কলিকাতা নগরীর পত্তন করেছিলেন—(টমাস রো, হকিন্স, জব চার্ণক)

(খ) পণ্ডিচেরী ছিল—(ইংরেজদের, ওলন্দাজদের, ফরাসীদের বাণিজ্যকেন্দ্র)

(গ) শিবাজীর মৃত্যু হয়েছিল—(১৫৮০, ১৬৮০, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে)

(ঘ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল—(১৬৭১, ১৭৬১, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে)

(ঙ) শিখদের ধর্মগ্রন্থ—(বাইবেল, কোরান, গ্রন্থ-সাহেব)

(চ) খালসা বাহিনী গঠিত হয়েছিল—(গুরু তেগবাহাদুর, গুরু গোবিন্দ ও বান্দার আমলে)

ঘটনাপঞ্জী

১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০)—শিবাজীর জন্ম।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে—শিবাজীর মৃত্যু।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে—জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরীর পত্তন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করে ভারতে আসার জলপথের সন্ধান দিলেন।

২। আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য বিস্তার করেন।

৩। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন।

৪। বাংলাদেশে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে —হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগর।

৫। শিবাজীর সময়ে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

৬। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা ও আফগানদের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল।

৭। গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে নবদীক্ষিত শিখদের নাম হল খালসা।

৮। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর বান্দা শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হন।

সূচনা ঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিল। দিল্লীর রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায়, দেশময় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়। মারাঠা, রাজপুত ও শিখ বীরেরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সম্রাটরা শক্তিহীন হয়ে নিজাম বা মন্ত্রীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রভাব দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় আবার নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণে মুঘলদের দুর্বলতা শেষ সীমায় পৌঁছায়।

এদিকে বাদশাহের দুর্বলতার সুযোগে বাংলার সুবাদার আলিবর্দী খাঁ, অযোধ্যার নবাব সাদাৎ আলি খাঁ, হায়দরাবাদের নিজাম সম্রাটের অধীনতা নামেমাত্রই স্বীকার করতেন। দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে হায়দার আলি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এইভাবে অষ্টাদশ শতকে ভারত বিভিন্ন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে একে পরাস্ত করে ইংরেজগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধ ঃ দেশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায়ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে তাদের

মধ্যে পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ **কর্ণাটের যুদ্ধ** নামে পরিচিত। **ডুপ্লের** নেতৃত্বে ফরাসীরা ভারতের রাজাদের পরস্পরের বিরোধের সুযোগ নিয়ে ভারতে একটি ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হলে হায়দরাবাদের এবং **কর্ণাট** রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। ফরাসীগণ এক পক্ষে আর ইংরেজগণ অপর পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষে ডুপ্লের মনোনীত একজন হায়দরাবাদের এবং ইংরেজের আশ্রিত একজন কর্ণাটের সিংহাসন লাভ করেন। দক্ষিণ ভারতে ডুপ্লের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কর্ণাটের শেষ যুদ্ধে (বন্দীবাসের যুদ্ধে) ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দূর হয়।

ডুপ্লে

কর্ণাটের যুদ্ধে **রবার্ট ক্লাইভ** সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। ক্লাইভ অল্প বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানীর কাজ নিয়ে ভারতে আসেন। পরে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সৈনিকের কাজ গ্রহণ করেন। ক্লাইভই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন।

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠাঃ বাংলাদেশে অনেকদিন ধরেই ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠী ছিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক বাংলার নবাবের অনুমতি নিয়ে ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি গ্রামে কুঠী স্থাপন করেন। পরে ইংরেজরা দুর্গ স্থাপনের অনুমতি পেয়ে ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটি দুর্গ স্থাপন করে। দু-বছর পরে তারা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রামের জমিদারীর বন্দোবস্ত করে নিল। এইভাবে যে কলিকাতা নগরী ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের উৎপত্তি হল, তাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল।

কলিকাতা নগরী স্থাপনের প্রায় ষাট বছর পরে ইংরেজরা বাংলায় নবাব **সিরাজ-উদ-দৌলার** বিরুদ্ধে এক গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগদান করল। ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফলে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হল। ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। কিন্তু সিরাজের সেনাপতি **মীরজাফর** বিশ্বাসঘাতকতা করায় ক্লাইভ সহজে তাঁকে পরাজিত করেন। সিরাজ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পলায়ন করার সময় বন্দী হলেন। নানারকম নির্যাতনের পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

তারপর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করে কার্যত বাংলাদেশ শাসন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তারা অপদার্থ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জামাতা **মীরকাশিমকে** নবাব করল। মীরকাশিম স্বাধীনচেতা ও

কর্মকুশলী ছিলেন। তিনি ইংরেজ প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন ইংরেজরা মীরকাশিমকে কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত করল। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব **সুজা-উদ্-দৌলা** ও দিল্লীর সম্রাট **শাহ-আলমের** সাথে মিলিত হয়ে আবার যুদ্ধ করলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে **বক্সারের যুদ্ধে** আবার মীরকাশিম পরাজিত হলেন।

ইংরেজরা পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার নবাব করল; তাকে বছরে তিপ্পান্ন

লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। মীরজাফরের পরে তাঁর পুত্র নিজাম-উদ্-দৌলা বাংলার নবাব হলেন। কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হল।

সিরাজ

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি এবং এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি দিয়ে ইংরেজরা তাঁর কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল। এর ফলে দেশের খাজনা আদায় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সব ব্যাপার চলে গেল ইংরেজদের হাতে। নবাবের হাতে শাসন ও বিচারের ভার ছিল। অথচ কোন ক্ষমতা ছিল না। এভাবে **দ্বৈত-শাসনের** প্রচলন হল। ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। নবাব ও কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলাদেশে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ফলে, বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত-হল। এই

মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ

দুর্ভিক্ষ **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে পরিচিত (১৭৭০ খ্রীঃ)। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

দ্বৈত-শাসনের কুফল দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর করে পাঠাল। এই সময় মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। হেস্টিংস শাসন, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ সংস্কার সাধন করলেন। তিনিই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে সর্বপ্রথম সুদৃঢ় করে তোলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

হায়দার আলি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারঃ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রথম বাধা ছিলেন মহীশূরের নবাব **হায়দার আলি**। তিনি একজন সামান্য সিপাহীর পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে মহীশূরের রাজার অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। পরে নিজের প্রতিভাবলে মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। রাজ্যবিস্তার করে তিনি মহীশূরকে ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দার আলি বুদ্ধিমান, সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন। তাঁর মত যোগ্য শাসক সে সময়ে ভারতে আর কেউ ছিলেন না। ইংরেজদের কৌশল তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা তাঁর হাতে বার বার পরাজিত হয়। তিনি ইংরেজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

হায়দারের মৃত্যুর পর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। টিপুও পিতার মত ইংরেজদের চিরশত্রু ছিলেন। ইংরেজদের অভিসন্ধি বুঝে তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি অক্লান্ত কর্মী, দক্ষ শাসক ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রখর ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের প্রকৃত শত্রু ইংরেজ। তাই তিনি ফরাসীদের সাহায্যে ইংরেজদের বিনাশের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি

ইংরেজদের পরাস্ত করে **ম্যাঙ্গালোর** দখল করেন। অবশেষে মাদ্রাজ সরকার টিপুর সাথে সন্ধি করেন। এই সন্ধি **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি** নামে পরিচিত (১৭৮৪ খ্রীঃ)।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সাথে ইংরেজদের আবার যুদ্ধ শুরু হল। এই হল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী **শ্রীরঙ্গপত্তম** অবরোধ করলে টিপু পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি করলেন। মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ টিপুর হস্তচ্যুত হল। তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজরা ধরে রেখেছিল; তবুও তিনি স্বাধীনতা বিসর্জন দেননি।

টিপু সুলতান

টিপু **অধীনতামূলক মিত্রতা** নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে লর্ড ওয়েলেসলী মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলেন। ইংরেজ বাহিনী তাঁর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এইভাবে স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অবসান হল। টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজরা কর্ণাটকের নবাবকে পদচ্যুত করে কর্ণাটক অধিকার করে এবং সুরাট, তাঞ্জোরও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মারাঠা শক্তির পরাজয়ঃ ইংরেজদের বিজয়ের পথে আর এক প্রবল বাধা ছিল মারাঠা শক্তি। মারাঠাদের গৌরবের মূলে ছিলেন পেশোয়ারা। তাঁরা প্রথমে মারাঠা রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, পরে তাঁরাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন। শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্য পেশোয়াদের দক্ষতায় বিস্তার লাভ করে এবং ভারতের এক সুবৃহৎ অংশে মারাঠা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ এবং দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম অংশ মারাঠাদের অধিকারে আসে। দিল্লীর মুঘল সম্রাটকেও তাঁদের প্রাধান্য মেনে চলতে হয়েছিল। পেশোয়াদের মধ্যে **বালাজী বিশ্বনাথ, প্রথম বাজীরাও** এবং **বালাজী বাজীরাওয়ের** কৃতিত্ব অসাধারণ।

পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের আমলেই মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। বালাজী বাজীরাওয়ের ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আহম্মদ শাহ্ আবদালীর প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে পাঞ্জাব অধিকার করলেন। ফলে, আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ বাধে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে **পানিপথের** তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের সৈন্যবাহিনী আবদালীর হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

মারাঠাদের পরাজয় উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে। এরপর পেশোয়া মাধব রাও মারাঠাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা আর সম্ভব হল না। পরবর্তী পেশোয়া নারায়ণ রাও আততায়ীর হাতে নিহত হলে, পেশোয়া পদ নিয়ে মারাঠা নায়কদের মধ্যে বিবাদ বাধে। অধিকাংশ মারাঠা নায়ক নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করতে মনস্থ করলেন। অপরপক্ষে, নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে ইংরেজদের সাহায্য চাইলেন। মারাঠা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার এই সুযোগ ইংরেজরা ছাড়ল না। এইভাবে ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। শেষে, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে **সলবাঈ-এর সন্ধিতে** প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে।

নানা ফড়নবীশ

এই সময়ে মারাঠাদের অন্যতম নায়ক ছিলেন **নানা ফড়নবীশ**। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তাঁর কৌশলে মারাঠা সেনাপতিরা গৃহবিবাদ ভুলে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকে। রঘুনাথ রাওকে ইংরেজরা পেশোয়া পদে বসাতে পারল না। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হলে মারাঠাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব দেখা দিল। পুনা দরবারে আধিপত্য স্থাপন করবার জন্য সিন্ধিয়া ও হোলকারের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। হোলকার পুনা অধিকার করলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে **বেসিনের সন্ধি** দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। মারাঠা সাম্রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল।

পেশোয়া কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করলেও অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন না। পেশোয়া তাঁর ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ল। ইংরেজদের যুদ্ধ কৌশল ও চাতুরীতে মারাঠা নায়করা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। শেষ আঘাত এল তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। মারাঠারা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হল। মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিকাংশই ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হল। মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ ভেঙে দেওয়া হল, পেশোয়া পদ লোপ পেল, মারাঠা শক্তির পতন হল এবং ইংরেজদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

অধীনতামূলক মিত্রতা ঃ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইংরেজরা রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করে। তারা এক নতুন নীতির প্রবর্তন করে—এর নাম **অধীনতামূলক মিত্রতা**। এই নীতির প্রবর্তন করেন **লর্ড ওয়েলেসলী**। কোনও রাজ্য এই মিত্রতা গ্রহণ করলে, ইংরেজরা সেই রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। তার পরিবর্তে মিত্র রাজাকে তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হত, অথবা নগদ টাকা দিতে হত এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধি করার অধিকার ত্যাগ করতে হয়। এই মিত্রতার অর্থ হল বশ্যতা স্বীকার। কেবলমাত্র হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব এই মিত্রতা গ্রহণ করে ইংরেজদের অধীন হলেন। পরে কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ইংরেজরা অধিকার করে নেয়।

সমাজ-সংস্কার ঃ ইংরেজরা কেবল যুদ্ধ করেই ভারত জয় করতে চাইল না। নানাপ্রকার সংস্কারের মধ্য দিয়ে সারা দেশের এক শ্রেণীর লোকের মন জয় করবার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেশে এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা তুলে দিলেন, ঠগী দস্যুদের দমন করলেন। লর্ড ময়রা পিণ্ডারী দস্যুদের দমন করেন। লর্ড হার্ডিং দেশে রেলপথ ও সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন শুরু হল। এর ফলে, ইংরেজরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে থাকে। ভারতে রাজ্যবিস্তারে এই সম্প্রদায় ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ ঃ পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহাসিংহ সুকারচুকিয়া মিসলের নায়ক ছিলেন। শিখগণ বারোটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের নায়ক একটি রাজ্যশাসন করতেন। বারো বছর বয়সে রণজিৎ সিংহ পিতৃহীন হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় আফগানরা পাঞ্জাব জয় করে। রণজিৎ সিংহ মাত্র উনিশ বছর বয়সে জামান শাহের অধীনে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শিখজাতির ছোট দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। অমৃতসর ও লুধিয়ানা তাঁর হস্তগত হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে **অমৃতসরের সন্ধির** ফলে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ইংরেজরা শতদ্রু নদীর উত্তরে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে না বলে আশ্বাস দিল। শতদ্রুর উত্তরে মুলতান, পেশোয়ার ও কাশ্মীর জয় করে এবং আফগানদের পরাজিত করে তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। রণজিৎ সিংহ সুশাসক ও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ফরাসী পর্যটক **জ্যাকেমোঁ** তাঁকে ভারতের নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজের সঙ্গে শিখদের আর মিত্রতা বজায় থাকল না। রণজিৎ সিংহের

উত্তরাধিকারী ছিল না ; ফলে নেতার অভাবে শিখ সৈন্যবাহিনী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। এই গোলযোগের মধ্যে **খালসা** সৈন্যদল প্রবল হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা **লালসিংহ ও তেজাসিংহ** নামে শিখ সেনানায়কের হস্তগত হয়। শিখ সৈন্যবাহিনী শতদ্রু নদী পার হয়ে দক্ষিণে লুঠতরাজ শুরু করল। এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে **প্রথম শিখ যুদ্ধ** আরম্ভ হল (১৮৪৫ খ্রীঃ)। শিখরা অসামান্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও, মন্ত্রী ও সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জয়ী হতে পারেনি। ইংরেজরা শিখ রাজ্যের এক অংশ কেড়ে নিল। কিন্তু শিখগণ দু'বছর পরে আবার বিদ্রোহী হল। এইভাবে দ্বিতীয় **শিখ যুদ্ধ** শুরু হয়। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে **চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাট** নামক স্থানের যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। ইংরেজরা পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার করে।

অন্যান্য রাজ্য অধিকার : ইংরেজরা কুশাসনের অজুহাতে **অযোধ্যা** রাজ্যটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল। হায়দরাবাদের নিজাম বৃটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে না পারলে তাঁর নিকট থেকে **বেরার** প্রদেশটি অধিকার করা হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসী তাঁর **স্বত্ববিলোপ নীতির** দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার করেছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধিকার করার জন্য অপুত্রক রাজাদের দত্তক গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হল। ফলে, দেশীয় রাজারা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে, রাজ্যগুলি ইংরেজদের অধিকারে এল। এই নীতি অনুসারে ডালহৌসী সাতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর, উদয়পুর, ভগৎ, কারাউলি প্রভৃতি রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

শিখদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ইংরেজরা সিন্ধুপ্রদেশ দখল করেছিল। এই সময়ে দক্ষিণ-ব্রহ্ম অধিকৃত হয় এবং কিছুকাল পরে উত্তর ব্রহ্মও বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। পশ্চিমে অবস্থিত আফগানিস্তানের সাথে ইংরেজদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। রাশিয়ার ভারত আক্রমণের ভয়ে ইংরেজ শঙ্কিত থাকত। তাই আফগান সিংহাসনে একজন মিত্র রাখাই ইংরেজদের ইচ্ছা। ইংরেজ বাহিনী কাবুল, কান্দাহার ও গজনী অধিকার করে নিল। এইভাবে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড ময়রা ও লর্ড ডালহৌসীর কৃতিত্ব অসাধারণ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ : লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।

কতকগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল হিসেবেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী একটির পর একটি ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করার ফলে সেই সব রাজ্যের কর্মচ্যুত সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতে যখন রাজ্যচ্যুত রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জন্য সিপাহীদের আহ্বান জানালেন, তখন সিপাহীরা সহজেই তাতে সাড়া দিলেন।

লর্ড ডালহৌসী স্বত্বলোপনীতির সাহায্যে ভারতের রাজ্যগুলি অধিকার করেছিলেন। রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই তাঁর কাছে নিষ্কৃতি লাভ করেনি। অযোধ্যা দখল করায় অযোধ্যা অঞ্চলের মুসলমানরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি লোপ

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

লক্ষ্মীবাই

করায় অনেক ভারতবাসীই, বিশেষ করে হিন্দুরা, অসন্তুষ্ট হয়েছিল। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের উপাধি বিলোপ করার চেষ্টার ফলে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হল। অযোধ্যার নবাবের পরামর্শদাতা আহম্মদ-উল্লা, নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতীয় বৃত্তিভোগীদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হল। বহু ভারতীয় জমিদার ও সম্পত্তিচ্যুত রাজারা আর্থিক কারণে ইংরেজের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ইংলণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রী ভারতবর্ষে আসবার ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল এবং কুটির শিল্পের ওপর নির্ভরশীল বহু ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হল।

ইংরেজরা ভারতে নানারকম সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে। সতীদাহ প্রথার বিলোপ, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন লাভ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বহু গোঁড়া হিন্দু ধারণা করে যে,

ইংরেজরা হিন্দু সমাজ ও ধর্মকে নষ্ট করে দিতে বদ্ধপরিকর। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ডালহৌসীর সময় রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রবর্তন ভারতবাসীর সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করে।

সৈন্যবিভাগে ব্রাহ্মণ, রাজপুত প্রভৃতি উচ্চজাতির অনেক মানুষ চাকরি করত। সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে গেলে ধর্ম নষ্ট হবে তাই ছিল তাদের ধারণা। সিপাহীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ব্রহ্মদেশে পাঠান হল। ক্রিমিয়ায় যুদ্ধের সময় তাদের বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা শুরু হলে সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সৈনিকদের বেতনের বৈষম্যও সিপাহীদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

সিপাহীদের যখন এই রকম মনের অবস্থা তখন এনফিল্ড রাইফেল নামে এক নতুন ধরনের বন্দুকের প্রবর্তন সিপাহীদের মনে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এর টোটাগুলি দাঁতে কেটে বন্দুকে পুরতে হত। চতুর্দিকে রটে গেল যে, এই টোটায় গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করার জন্যই এনফিল্ড রাইফেল চালু করা হয়েছে। এর ফলে সিপাহীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বিদ্রোহের গতি ঃ বঙ্গদেশে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহ প্রথমে আরম্ভ হল। ব্যারাকপুর সেনানিবাসের মঙ্গল পাণ্ডে চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মত হলে তাঁর ফাঁসি হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই মীরাটে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিল। দেখতে দেখতে অযোধ্যা, দিল্লী, কানপুর বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, বিহার প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা মুঘল বংশের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করল। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপী এবং জগদীশপুরের জমিদার কুনওয়ার সিংহ। লক্ষ্মীবাঈ বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী আজও আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। মারাঠা বীর নানাসাহেব নিজেকে কানপুরে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেব পরাজিত হয়ে নেপালে পালিয়ে যান। সম্ভবতঃ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁতিয়া তোপি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর ফাঁসি হয়।

শিখ ও গুর্খা সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজরা শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করল। দুই পুত্র ও এক পৌত্রসহ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ বন্দী হলেন। ইংরেজ সেনাপতি হডসন রাজকুমারদের গুলি করে হত্যা করলেন আর বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন।

বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি-নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বীর সাভারকার একে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই বিদ্রোহ ছিল মূলত বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ। তৎকালীন

শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে ব্রিটিশ বিরোধী এক বিরাট, ব্যাপক ও প্রচণ্ড সংগ্রাম বলা যেতে পারে। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে এই বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে আরম্ভ হলেও শুধু তাদের মধ্যেই এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। যদিও বিদ্রোহী নেতাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল অনেকাংশে ভিন্ন তবুও কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রকৃত গণঅভ্যুত্থানের আকার নেওয়াতে এবং ইংরেজ বিতাড়ন সম্পর্কে বিদ্রোহীদের কোন দ্বিমত না থাকাতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়। বস্তুত, এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগায়।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করলেও দিল্লী, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও বিহারের কোন কোন অংশ ছাড়া বিদ্রোহীরা দেশবাসীর সাহায্য পায়নি। শিখ, গুর্খা ও রাজপুত সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। বিদ্রোহীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধার জন্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজদের পক্ষে ডাক ও তার বিভাগের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা অনেক সহজ ছিল। ইংরেজদের সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল বিদ্রোহীদের থেকে ভাল ছিল। সিপাহীদের মধ্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া কোন সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন না। অপরদিকে হ্যাভলক, আউট্রাম, ক্যাম্পবেল, নিকলসন প্রভৃতি সুদক্ষ সেনানায়করা ইংরেজবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিদ্রোহের ফলাফল ঃ অবশ্য, এই বিদ্রোহ যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলা চলে না। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এতদিন পর্যন্ত ভারতের শাসনভার ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতেই ছিল। বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকরা মনে করলেন, ভারতের মতো বিশাল দেশের শাসনভার একটি বণিক সমিতির হাতে রাখা আর সমীচীন নয়। সেজন্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এক আইন করে ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকার নিজের হাতে নিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে ইংলণ্ডের **রাণী ভিক্টোরিয়া** ভারতের রাণী হলেন। তাঁকে ভারত শাসন ব্যাপারে পরামর্শ

রাণী ভিক্টোরিয়া

দেওয়ার জন্য একজন **ভারত-সচিব** নিযুক্ত হলেন। ঐ সময় থেকে ভারতের ইংরেজ শাসনকর্তা গভর্নর-জেনারেল-এর পরিবর্তে **ভাইস্‌রয়** নামে অভিহিত হন।

ভারতীয় জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করলেন যে, (১) ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না ; (২) যোগ্যতা অনুসারে ভারতবাসীরা সকল রাজকার্যে নিযুক্ত হতে পারবে ; (৩) কোম্পানীর আমলের শর্তগুলি ঠিকমত মেনে চলা হবে ; (৪) ইংরেজরা অতঃপর আর দেশীয় রাজ্য অধিকার করবে না ; (৫) বৃটিশ প্রজাদের হত্যাকার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করা হবে ; (৬) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট পাস করে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাপত্রকে ভারতের জনসাধারণের ম্যাগনা কার্টা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং বৃটিশ সরকার সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করে।

বৃটিশ শাসনের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ : ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কোম্পানীর একশ বছরের শাসনের ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবধান বাড়ে। ইংরেজ কর্মচারীদের অহমিকা ও ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা লক্ষ্য করে বহু ভারতবাসী ইংরেজদের সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে "অধীনতামূলক মিত্রতা" নীতির ফলে বহু দেশীয় রাজা ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। তাঁদের রাজ্য থাকল বটে কিন্তু ক্ষমতা বলতে কিছুই থাকল না। সব ক্ষমতার অধিকারী হলেন ইংরেজ শাসকরা। এর পর "স্বত্ব-বিলোপ নীতি" নামে আর এক উপায়ে অনেক দেশীয় রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এই সব রাজাদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দিল। ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের শাসন-সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পদে সুযোগ দিতে অস্বীকার করে। ফলে, ভারতবাসীর মধ্যে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্পৃহা দেখা দিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ভারতীয় সম্পদ শোষণ। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা অবিরত ভারতের সম্পদ লুঠ করে ভারতকে ধ্বংস করেছে। চাষীর উপর খাজনা বাড়িয়ে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিতে চাষীর অধিকার নষ্ট করে তারা দেশের কৃষিকে ধ্বংস করেছে। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটীর শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতবাসী ক্রমেই কৃষি-আশ্রয়ী হয়ে উঠতে লাগল। দেশীয় বাণিজ্য ইংরেজ বণিকদের হাতে চলে গেল এবং দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কৃষক ও চাষীদের উপর নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে যে

আন্দোলন করেছিল তা "নীল-বিদ্রোহ" নামে খ্যাত। এই সকল কারণে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক শোষণ।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ইংরেজদের বঙ্গদেশ অধিকার বর্ণনা কর।

৩। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের কথা কি জান বল।

৪। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। রণজিৎ সিংহ কিভাবে শিখরাজ্য গঠন করেন এবং কিরূপে এই রাজ্যের পতন হয়?

৬। সিপাহী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। ভারতে বৃটিশ শাসনের ফল কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মীরকাশিমের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

২। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিভাবে দেওয়ানী লাভ করল? এর গুরুত্ব কি?

৩। মারাঠা শক্তির কিভাবে পতন ঘটে?

৪। "অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি" বলতে কি বোঝ? এই নীতির দ্বারা ভারতে বৃটিশ রাজ্য কিভাবে বিস্তারলাভ করে?

৫। কোম্পানীর আমলে সমাজ-সংস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। "স্বত্ববিলোপ নীতি" বলতে কি বোঝ? এই নীতির দ্বারা ভারতে বৃটিশ রাজ্য কিভাবে বিস্তারলাভ করে?

৭। অন্যান্য রাজ্যে কোম্পানীর বিস্তার নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) বাংলাদেশে সর্বশেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? (খ) কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন্ সম্রাটের আমলে কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করেছিল? (গ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করেছিল? (ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? (ঙ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অর্থ কি? (চ) রণজিৎ সিংহের পিতার নাম কি? (ছ) কোন্ ফরাসী পর্যটক রণজিৎ সিংহকে ভারতের নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছিলেন? (জ) স্বত্ববিলোপ নীতির অর্থ কি? (ঝ) ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?

২। **সঠিক উত্তরটি রেখে অন্যগুলি বাদ দাও ঃ**

(ক) কার সঙ্গে যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌল্লা পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হন—

(ডুপ্লে, ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস)

(খ) মারাঠাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত—(দেওয়ান, পেশোয়া, কাজী)

(গ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন—
(লর্ড কর্ণওয়ালিশ, লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড হেস্টিংস)

(ঘ) ভারতের নেপোলিয়ন কাকে বলা হত—
(দিলীপ সিংহ, রণজিৎ সিংহ, নৈনিহাল সিংহ)

(ঙ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়—(ব্যারাকপুর, মীরাট, কানপুর)

(চ) কোন্ আইনের দ্বারা বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ?
(১৮৬১, ১৮৯২, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন)

৩। **নিম্নলিখিত নাম ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজাও :**

(ক) ওয়েলেসলী, ক্লাইভ, কর্ণওয়ালিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, ডালহৌসী।

(খ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি, অমৃতসরের সন্ধি, বেসিনের সন্ধি, সলবাঈ-এর সন্ধি, স্বত্ববিলোপ নীতি, অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

(গ) পলাশীর যুদ্ধ, প্রথম শিখ যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

ঘটনাপঞ্জী

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে — পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৬৪ " — বক্সারের যুদ্ধ।
১৭৬৪ " — কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ।
১৭৯৯ " — মহীশূর রাজ্যের পতন।
১৮৩৯ " — রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।
১৮৫৭ " — সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮৫৮ " — কোম্পানীর শাসনের অবসান ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণ।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হয়েছিল।

২। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

৩। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

৪। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবাঈ-এর সন্ধিতে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়।

৫। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তির পতন হয়।

৬। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ রণজিৎ সিংহকে ভারতের নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছিলেন।

৭। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়।

৬ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বের ইতিহাসের তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা হল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব। এই কারণে অষ্টাদশ শতককে **বিপ্লবী শতক** বলা যায়।

(ক) **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধঃ** পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, আটলান্টিকের অন্য তীরে আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা **রেড ইণ্ডিয়ান** নামে পরিচিত। এই বিশাল ভূখণ্ডে সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে একজনও ইংরেজ বসবাসকারী ছিল না। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেমস ইংলণ্ডের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্লিমাউথ কোম্পানী এবং লণ্ডন কোম্পানী নামে দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দুটি কোম্পানীর ১০৫ জন কর্মচারী ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় আসে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সুবিধাজনক জীবনযাত্রার আশায় ১০২ জন ইংরেজ মে ফ্লাওয়ার জাহাজ-যোগে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় উপনীত হয়। ক্রমে ক্রমে জনবসতি বেড়ে ওঠে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য উপজাতিদের হত্যা ও বিতাড়িত করে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই বিশাল ভূখণ্ডে ইংলণ্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইংলণ্ড ছাড়াও ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপের অন্য দেশগুলি আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য ও বসতি স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর আমেরিকায় তেরোটি বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই উপনিবেশের জনসংখ্যা ছিল পনের লক্ষেরও বেশী।

উপনিবেশগুলির সাথে ইংলণ্ডের সম্পর্ক : প্রত্যেক উপনিবেশে একজন গভর্নর বা শাসনকর্তা থাকতেন। গভর্নর অথবা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতেন না। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি বিষয়ে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন। তা হল ঔপনিবেশিকরা ইংলণ্ডের অনুমোদন ছাড়া অন্য কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে আদান-প্রদান করতে পারবে না। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঔপনিবেশিকরা নামে ইংলণ্ডের অধীন হলেও আভ্যন্তরীণ শাসন-বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করত।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ : ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন তৃতীয় জর্জ। তখন থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করলেন যে, যেহেতু তাঁরা আমেরিকায় আভ্যন্তরীণ ও উপকূল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেইজন্য আমেরিকার অধিবাসীদের দেশ রক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা নূতন নূতন কর ধার্য করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। এতে ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠল। এতদিন পর্যন্ত তারা পার্শ্ববর্তী ফরাসী উপনিবেশ কানাডা রাজ্যের ভয়ে ভীত ছিল। এরপর সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয় এবং কানাডার অধিকার লাভ করে (১৭৬৩ খ্রীঃ)। এতে ঔপনিবেশিকদের মন থেকে ফরাসী ভীতি দূর হয় এবং ইংরেজ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তখন আমেরিকানদের স্বাধীন জাতি হিসাবে অবাধ স্বায়ত্তশাসনাধিকারের আগ্রহ বাড়তে লাগল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী **গ্রেনভীল 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট'** নামে এক নতুন অর্থনৈতিক আইন জারি করেন। এই আইন অনুযায়ী আমেরিকান ঔপনিবেশিকদের দলিল-পত্রে বাধ্যতামূলকভাবে স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে বলা হয়। তখন আমেরিকানরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করল। বৃটিশ পার্লামেণ্টে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই, সুতরাং ঐ সভার নির্দেশে কোন কর দিতে তারা বাধ্য নয়। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক আন্দোলনের চাপে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট রদ হল ; কিন্তু চা প্রভৃতি কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের ওপর শুল্ক থেকে গেল। এতে ঔপনিবেশিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে এক অভিনব উপায়ে প্রতিবাদ জানাল। একদিন চা-বোঝাই এক জাহাজ বোস্টন বন্দরে নোঙর করলে ঔপনিবেশিকরা রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে সমস্ত চা জলে ফেলে দিল। এই ঘটনা ইতিহাসে **বোস্টন টী পার্টি** নামে খ্যাত। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বোস্টনের অধিবাসীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। সৈন্যদল বোস্টনে পেঁছলে শহরের অধিবাসীরা তাদের বাধাদান করে এবং উভয়পক্ষে বহুলোক হতাহত হয়।

ইংরেজ সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে (১) বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেন,
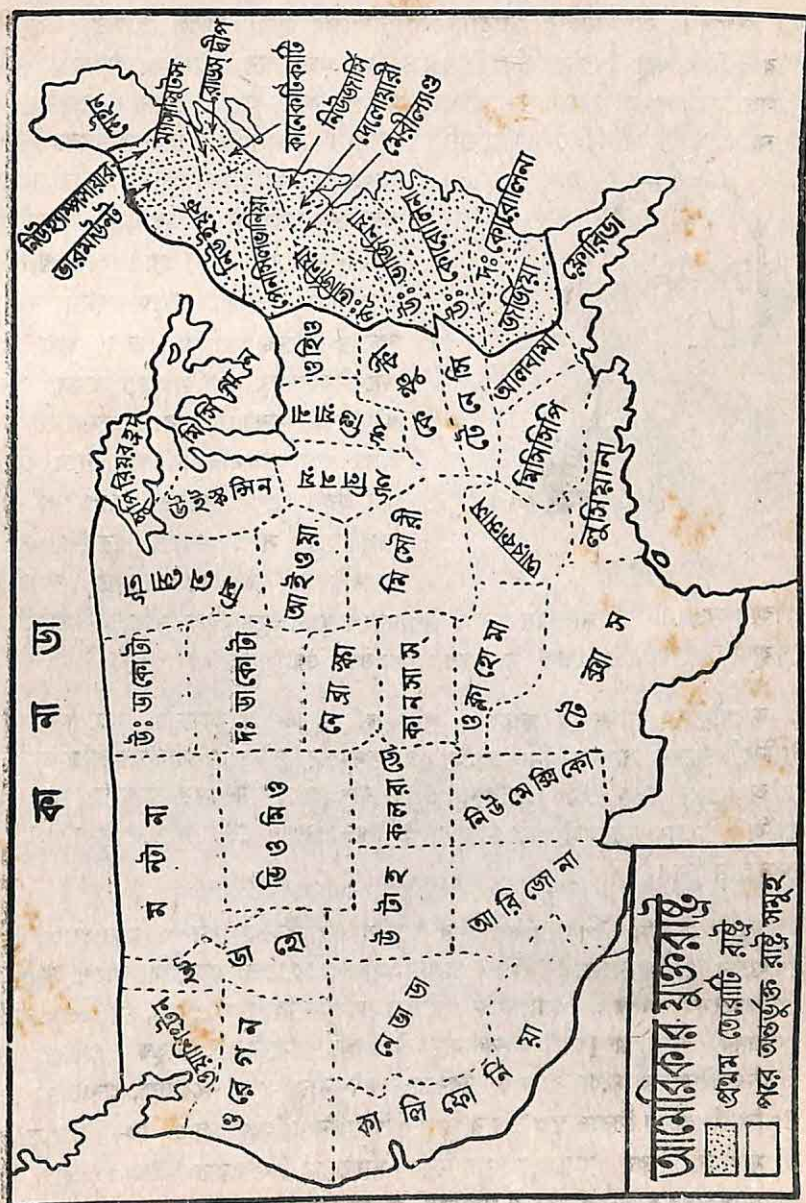
(২) ম্যাশাচুসেট উপনিবেশটির স্বায়ত্তশাসন নাকচ করে দিলেন, (৩) উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ এই সব বিধি-ব্যবস্থা ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহী করে তোলে। আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের মধ্যে কেবল জর্জিয়া ছাড়া সব কটির প্রতিনিধিরা **ফিলাডেলফিয়া** শহরে এক সম্মেলনে সমবেত হলেন। বৃটিশ সরকারের কাছে তাঁরা তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার দাবি করলেন। তৃতীয় জর্জ তাঁদের এই আবেদনের কোন মূল্য দিলেন না। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র প্রচার করা হয়। এর ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জর্জ ওয়াশিংটন স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। ফরাসী সরকার ইংরেজ শক্তিকে জব্দ করার জন্য আমেরিকানদের পূর্ণ সাহায্য করেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করেন। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ নিয়ে গড়ে উঠল স্বাধীন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকার সাফল্যের কারণ ঃ শক্তিশালী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সাফল্য নিঃসন্দেহে এক চমকপ্রদ ঘটনা। সামরিক শক্তি ও সামর্থ্য বা অর্থবলের দিক থেকে মার্কিন ঔপনিবেশিকগণ বৃটিশদের তুলনায় ছিল খুবই দুর্বল। তবুও কয়েকটি কারণের জন্য ঔপনিবেশিকগণ বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

(১) মার্কিন ঔপনিবেশিকগণের দুর্বার স্বাধীনতাস্পৃহা ও আত্মত্যাগ তাদের সাফল্যের প্রধান কারণ। (২) তাদের সাফল্য লাভের অন্যতম কারণ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব। ওয়াশিংটন ছিলেন অতুলনীয় দেশপ্রেমিক, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জননায়ক এবং রণকুশলী সেনানায়ক। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব একদিকে যেমন ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে তেমনি ঔপনিবেশিকদের সৈন্যদলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। (৩) ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্ব ইংলণ্ডের সামরিক সাফল্যের অন্তরায় ছিল। (৪) বৃটিশ সেনানায়কদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সামরিক ভুলভ্রান্তি আমেরিকানদের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। (৫) ফরাসীদের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যও ঔপনিবেশিকদের জয়লাভে সহায়তা করেছিল।

ফলাফল ঃ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রে তিনটি গণতান্ত্রিক নীতি মেনে নেওয়া হয়। সেগুলি হল ঃ (১) জীবন ধারণ, স্বাধীনতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। (২) প্রত্যেক দেশের সরকার সেই দেশের জনগণের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। (৩) সরকার অত্যাচারী হয়ে উঠলে তাকে পদচ্যুত করার অধিকার অর্থাৎ বিপ্লবের অধিকার জনসাধারণের আছে। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পরে আমেরিকার নতুন শাসনতন্ত্রে (১৭৮৭ খ্রীঃ) এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত নীতিগুলি গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে আমেরিকা একটি যুক্তরাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হয়। শাসন-বিষয়ক সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি প্রতিনিধিসভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করেই মার্কিন গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের মূলনীতি ছিল সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। পরবর্তীকালে এই নীতিগুলি ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রভাব। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভে সাময়িকভাবে ইউরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ প্রসারের স্পৃহা হ্রাস করে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার ফলে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন আমেরিকার উৎপত্তিতে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির প্রকৃষ্ট সফল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছিল। বস্তুত আমেরিকার বিপ্লবীগণ ইউরোপীয় দার্শনিকদের রচনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

(খ) **ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার ফলে শ্রমশিল্পে যন্ত্রের প্রয়োগ হতে লাগল। মানুষের শ্রমশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি অর্থাৎ বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি শিল্প-সৃষ্টির কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংলণ্ডে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠল—যেমন—বয়ন, লোহ ও কয়লা। এইভাবে ইংলণ্ডের শ্রম-শিল্পের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হল, তা **শিল্পবিপ্লব** নামে পরিচিত। ধীরে ধীরে এই বিপ্লব উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ইংলণ্ড থেকে শিল্প-বিপ্লবের ধারা ক্রমে সমস্ত ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পবিপ্লবের কারণ ঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে এক নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কারিগর ও ক্রেতার মধ্যে ছিল এই মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা। এদের প্রচুর অর্থ ছিল ; এরা নিজেদের স্বার্থে কারিগরদের নিযুক্ত করতে লাগল। এইভাবে ধীরে ধীরে কারখানা গড়ে উঠতে লাগল। বণিকরাই হল এই সব কারখানার মালিক। এর ফলে, কারিগররা তাদের স্বাধীন বৃত্তি ছেড়ে কারখানার মজুর হল। একই কারখানায় বহু কারিগর একত্রিত হওয়ায় শ্রম-বিভাগ চালু হল। এই শ্রম-বিভাগই মূলতঃ শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত করল। কারিগররা কারখানার মালিকদের উপর সম্পূর্ণভাবে

নির্ভরশীল হয়ে উঠল। এইভাবে এক নতুন শ্রেণীর জন্ম হল। কারিগররা পরিণত হল কলকারখানার শ্রমিকে।

এই শিল্পবিপ্লবকে দ্রুত ও সম্পূর্ণ করে তুলতে প্রয়োজন বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার। তাই ঐতিহাসিকগণ একে যন্ত্রবিপ্লবও বলে থাকেন।

কৃষিবিপ্লব ঃ কলকারখানার উন্নতির ফলে দেশের বহুলোক কৃষি ও পশুপালন ছেড়ে কলকারখানায় যোগ দেওয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সে সমস্যারও সমাধান হল। চাষের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষিকার্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এল। এতদিন দু'বছর পর-পর এক জমিতে ফসল তুলে, তৃতীয় বছরে সেই জমি আর চাষ করা হত না। তাতে জমির উর্বরতা ঠিক থাকত। ফলে প্রতি বছর দেশের এক-তৃতীয়াংশ আবাদী জমি পতিত থাকত। এই সময়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রী **লর্ড টাউনসেণ্ড** পরীক্ষা করে দেখালেন যে, জমিতে প্রতি বছর বিভিন্ন ফসল ফলালে জমির উর্বরতা বাড়ে। কাজেই কোন জমি এক বছর ফেলে রাখবার প্রয়োজন নেই। এই প্রথা চালু হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে গেল। জমিতে সার দেওয়ার বৈজ্ঞানিক পন্থাও আবিষ্কৃত হল। এর কিছুদিন পরে উন্নত ধরনের কলের লাঙ্গল তৈরী হওয়াতে, অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বহু জমি চাষ করা সম্ভব হল। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে **জেখরো টাল** জমি চাষ করার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

পশুপালনের ব্যবস্থারও উন্নতি হল। কৃষির উন্নতির ফলে পশুর খাদ্যের অভাব থাকল না। **বেকওয়েল** নামে ইংলণ্ডের এক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু ও ভেড়া প্রতিপালন করেন। লোকে তাঁর প্রথা অবলম্বন করায় দুধ ও মাংসের উৎপাদন বহু গুণ বেড়ে গেল।

অন্যান্য আবিষ্কার ঃ বয়নশিল্পের উপর যন্ত্র বিপ্লবের প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের **জন কে** কলের মাকু আবিষ্কার করেন। কলের মাকুতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্ভব হওয়ায় সুতোর দরকার হয়ে পড়ল বেশী। সুতো যোগানোর জন্য **হারগ্রীভস্** ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এর নাম **স্পিনিং জেনী**। তারপর **আর্করাইট** জলের স্রোতের সাহায্যে চালিত সুতো কাটবার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। **ক্রম্পটন** মিহি সুতো কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তাতে সব সুতো বুনবার জন্য **কার্টরাইট** পাওয়ার লুম আবিষ্কার করেন। ফলে বস্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল।

বয়নশিল্পর চরম উন্নতি হল বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের ফলে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে **জেমস্ ওয়াট** বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করলেন। অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রমে প্রচুর বস্ত্রের উৎপাদন আরম্ভ হল।

পূর্বে জ্বালানী হিসেবে কাঠেরই প্রচলন ছিল। এই সময় অনেক অঞ্চলে কয়লা ও লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়। জ্বালানী হিসেবে কয়লার প্রচলন বেড়ে

গেল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কয়লার সাহায্যে লোহা গলাবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। জেমস্ ওয়াট বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে পাম্প চালিয়ে খনি থেকে জল তোলার ব্যবস্থা করলেন। এখন লোহার বড় বড় কারখানা গড়ে উঠল। লোহা ও ইস্পাত দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হতে লাগল।

যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো না থাকলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয় না। লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয় এবং উৎপাদন ব্যবস্থাও উন্নত হতে পারে না। তাই শিল্প-বিপ্লবের জন্য যানবাহনের উন্নতিরও খুবই প্রয়োজন ছিল। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জন ম্যাকাডাম পিচ-ঢালা রাস্তা তৈরীর উপায় আবিষ্কার করলেন এবং বিন্ডলে খাল কাটার উপায় আবিষ্কার করলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পীয় রেলগাড়ী তৈরী করলেন। ইংলণ্ডে ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত প্রথম রেলপথ খোলা হয়। আগে জাহাজ চলত পালের সাহায্যে। আমেরিকার **জন ফিট** প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণ করেন। তারপর
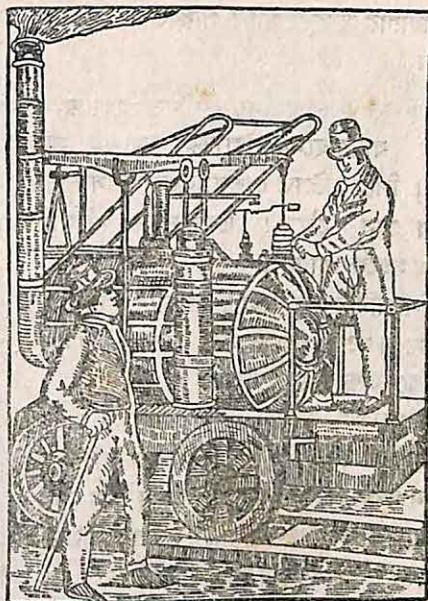
জেমস্ ওয়াট

বাষ্পচালিত যন্ত্র

জর্জ স্টিফেনসন

ফুলটন নামে এক ব্যক্তি আমেরিকায় বাষ্পীয় জাহাজ চালানো শুরু করেন। ইংলণ্ডের প্রথম বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার করেন **হেনরী বেল**।

শিল্পবিপ্লবের ফলাফলঃ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। মানবজাতি সভ্যতার পথে দ্রুত এগিয়ে গেছে।

বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায়, অল্প সময়ে ও ব্যয়ে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে। যানবাহনের উন্নতির ফলে এই সব পণ্য বিদেশে চালান দিয়ে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে। শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার হচ্ছে ও দেশগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়, ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যাদিও মানুষ সহজে পাচ্ছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে কারখানার সৃষ্টি হয়। একসঙ্গে বহু লোক কাজ করবার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠে এবং শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে।

সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ফলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হল। ইংলণ্ড ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পের প্রাধান্য স্থাপন করল। কৃষিকার্যের গুরুত্ব কমে গেল। কুটীরশিল্পের অবনতি হল। কারণ, কুটীরশিল্প যন্ত্রশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারল না।

(গ) **ফরাসী বিপ্লব**ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ইউরোপে সভ্যতার পথ-প্রদর্শক হয়ে ওঠে। তখন ফ্রান্সের রাজসভার ঐশ্বর্য এবং আদব-কায়দা ছিল আদর্শ স্থানীয়। ইউরোপের সকল দেশে শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেই ফরাসী ভাষায় কথা বলত। ফ্রান্সের প্রধান শহর **প্যারিসকে** বলা হত সভ্যজগতের রাজধানী।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের রাজারা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং ঈশ্বরদত্ত অধিকারে বিশ্বাসী। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সর্বজগতে সাম্যের বাণী প্রচার করে, কিন্তু বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে অসাম্যের অন্ত ছিল না। ফ্রান্সের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অভিজাত, উচ্চ শ্রেণী ও পুরোহিতগণকে কোন কর দিতে হত না। রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদে কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিযুক্ত হতেন। শিক্ষায় এবং সম্পদে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চপদ ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অভিজাত শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে বাধা পেতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়ে অত্যাচারিত জনসাধারণের পুরোভাগে দাঁড়ায়। আর শ্রমিক ও কৃষকদেরও দুঃখের অবধি ছিল না।

শিল্পবিপ্লবের আগে শহরের শ্রমজীবীদের অনেকে ছিল বেকার ; শহরে খাদ্যাভাবও মাঝে মাঝে দেখা দিত। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ নানাভাবে নির্যাতিত হত। অভিজাতগণ শিকারে আনন্দ উপভোগ করতেন। শিকারের সময় শস্যের ক্ষতি করলেও

কৃষকদিগকে তা সহ্য করতে হত। এমনকি গম পেষানো ও রুটি তৈরীর জন্যেও জমিদারকে কর দিতে হত। তার উপর ফ্রান্সের রাজারা ও অভিজাতগণ ছিলেন বিলাসী ও অমিতব্যয়ী। এইসকল ব্যয়ভার প্রজা-সাধারণকেই বহন করতে হত। ফলে বিপ্লবের আগে থেকেই প্রজা-সাধারণের মনে অসন্তোষ ছিল।।

রুশো

প্রাক্‌বিপ্লব চিন্তাধারার কয়েকজন নেতা ঃ রুশো, ভলতেয়ার ও মন্টেস্কু প্রমুখ ফরাসী লেখকগণ ফ্রান্সের শিক্ষিত লোকদের মনে বিপ্লবের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন। রুশোর রাজনৈতিক মত ছিল এই যে, রাজা ঈশ্বর-দত্ত অধিকারের বলে রাজ্য শাসনের অধিকারী নন; প্রজারাই রাজাকে রাজ্য শাসনের অধিকার দিয়ে থাকে এবং যে রাজা প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না, প্রজারা সে রাজাকে বিতাড়িত করতে ন্যায়তঃ অধিকারী। রুশোর জোরালো লেখা ফরাসীদের মনে উন্মাদনা এনেছিল। তাই রুশোকে বলা হয় ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মন্ত্রগুরু। রুশোর রচিত প্রধান গ্রন্থের নাম ছিল Social Contract বা সামাজিক চুক্তি।

ভলতেয়ার ছিলেন সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও গোঁড়ামির ঘোর বিরোধী। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং ফ্রান্সের রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী। ভলতেয়ারের লেখা বহু শিক্ষিত ফরাসীকে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছিল।

মন্টেস্কু ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন এবং প্রজার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাঁর রচিত "The Spirit of the Laws" নামক গ্রন্থ রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত বিষয়ের একটি অমূল্য রত্ন।

রুশো, ভলতেয়ার ও মন্টেস্কু প্রমুখদের চিন্তা দেশের জনসাধারণকে ক্রমে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলল। অপরপক্ষে, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রভাব ফরাসী জনসাধারণকে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলতে চেষ্টা করল। অনেকের মনে ধারণা জন্মাল যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে না পারলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা অবসানের কিংবা জাতির কল্যাণের কোন আশা নেই। এই ধারণারই চরম পরিণত হল **ফরাসী বিপ্লব**।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ কোন বিপ্লবই আকস্মিকভাবে ঘটে না। এর পশ্চাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণ থাকে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

রাজনৈতিক কারণঃ (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে ফ্রান্স ক্রমেই পতনের দিকে এগিয়ে যায়। চতুর্দশ ল্‌ই ছিলেন একজন যোগ্যতাসম্পন্ন সম্রাট। কিন্তু তিনি পর পর চারটি লোকক্ষয়ী য্‌দ্ধে লিপ্ত হন। শিল্প, বাণিজ্য, লোকবল ও অর্থবল সব কিছ্‌ই তাঁর য্‌দ্ধনীতির ফলে হ্রাস পায়। এই দ্‌রবস্থা মোচনের ক্ষমতা পঞ্চদশ ল্‌ই-এর ছিল না। তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক। ষোড়শ ল্‌ই ছিলেন অপদার্থ ও বিলাসী। তাই ব্‌রবোঁ বংশীয়দের শাসনকালে শোষণ

ভলতেয়ার

মণ্টেস্কু

ও অরাজকতা ফরাসী দেশের সর্বত্র প্রসারিত হল। (২) দেশের বিচারব্যবস্থা ছিল সম্প্‌র্ণ পঙ্গ্‌; বিনা বিচারে বাস্তিল দ্‌র্গে কারার্‌দ্ধ করে রাখা, যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। (৩) পর পর কয়েকটি য্‌দ্ধের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মর্যাদাও ক্ষ্‌ণ্ণ হয়।

ষোড়শ ল্‌ই

সামাজিক কারণঃ সামাজিক দিক থেকে ফরাসী জাতি বিশেষ অধিকারভোগী ও অধিকারহীন—এই দ্‌ইভাগে বিভক্ত ছিল। অধিকারভোগী শ্রেণী বলতে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদেরই বোঝাত। জনসাধারণ ছিল অধিকারহীন শ্রেণীভুক্ত। যাজকগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণী, অভিজাতগণ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং জনসাধারণকে তৃতীয় শ্রেণী নামে অভিহিত করা হত। স্বেচ্ছাচারী ব্‌রবোঁ রাজতন্ত্রে যাজকশ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী সমস্ত রকম স্‌যোগ-

সুবিধা ভোগ করত। এই দুই শ্রেণীকে সকল প্রকার কর থেকে রেহাই দেওয়া হত। কর যোগাবার দায়িত্ব ছিল কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শুধু তাই নয়, যাজক ও অভিজাতশ্রেণীরা কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করত।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। দীর্ঘকালের যুদ্ধনীতি, জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন, কর্মচারীদের দুর্নীতি, পঞ্চদশ লুইয়ের অতিরিক্ত আমোদপ্রিয়তা, বিলাসী ষোড়শ লুইয়ের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যকরী করার অভাব এবং সর্বোপরি আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে অর্থ সাহায্যদান প্রভৃতি ফরাসী রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক পতন ঘটিয়েছিল।

বিপ্লবের সূচনা ঃ ফ্রান্সের জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য চরমে এসে পৌঁছেছিল। বিলাস-ব্যসন ও যুদ্ধের ব্যয়ের ফলে রাজার ভাণ্ডারও হয়েছিল শূন্য। অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করা রাজা ষোড়শ লুইয়ের সাধ্য ছিল না। পনের বছর চেষ্টা করেও দেশের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হল না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি ফরাসী জাতির কাছে আবেদন করলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মতো ফ্রান্সেও এক পার্লামেণ্ট ছিল। এর নাম স্টেটস্ জেনারেল। একশ পঁচাত্তর বছরের মধ্যে এই সভার কোন অধিবেশন ডাকা হয়নি। এতদিন রাজারা মন্ত্রীদের সাহায্যেই শাসনকার্য চালাতেন। তখনকার সময়ে ফরাসী দেশে উচ্চপদের যাজকরা ছিলেন **প্রথম স্টেট** বা শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন **দ্বিতীয় স্টেট** এবং জনসাধারণ ছিলেন **তৃতীয় স্টেট**। এই তিনটি স্টেটের প্রতিনিধি নিয়ে স্টেটস জেনারেল গঠিত হত। প্রজাদের প্রতিনিধিরা এই সভায় সমবেত হয়েই নানাপ্রকার দাবী উত্থাপন করতে লাগলেন। দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। রাজার তা মনঃপূত হল না। তিনি সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা আদেশ মানতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁরা পাশের এক টেনিস খেলার মাঠে মিলিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন না করে তারা নিরস্ত হবেন না। স্টেটস্ জেনারেল জাতীয় **মহাসভা** বলে ঘোষিত হল। বিপ্লবের সূচনা হল।

বাস্তিলের পতন ঃ ফ্রান্সের বিপ্লবের সূচনায় রাজা ভীত হয়ে প্যারিসে সৈন্যদল ডেকে পাঠালেন। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে এক উন্মত্ত জনতা প্যারিসের কুখ্যাত কারাগার বাস্তিল ধ্বংস করে বন্দীদের মুক্ত করে দিল। এই দিনটি ফরাসীদের জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয়। বাস্তিলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল।

বিপ্লবের প্রসার ঃ প্যারিসের নাগরিকেরা নিজেদের মধ্য থেকে **জাতীয় রক্ষীবাহিনী** নামে সৈন্যদল গঠন করল। ক্রমে ফ্রান্সের সর্বত্র বিপ্লব আরম্ভ হল। বিদ্রোহীরা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সৌধাবলী ধ্বংস করতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে ভার্সাই প্রাসাদে জাতীয় মহাসভার প্রতিনিধিরা অনেক নূতন আইন প্রণয়ন করে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাগুলি তুলে দিল এবং মানুষের অধিকারের একটি তালিকা তৈরী করল। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচারিত হল। রাজা কিন্তু এতটা পরিবর্তন পছন্দ করলেন না। তিনি দেশ থেকে গোপনে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরা পড়ে নজরবন্দী হয়ে থাকলেন। তখন থেকে বিপ্লবীদের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। এই সময়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া** যুদ্ধ ঘোষণা করল। তখন ফ্রান্সের সর্বত্র দেশপ্রেমের প্রবল বন্যা দেখা দিল। দেশের সকল জায়গা থেকে স্বেচ্ছাসেবকের দল আসতে লাগল। প্যারিসের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল এবং রাজপরিবারকে বন্দী করল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। বিপ্লবীরা অন্যান্য দেশকে স্বৈরাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান করল। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সৈন্যগণ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ও রাণীকে দেশদ্রোহের অপরাধে হত্যা করা হল।

রাজার শিরশ্ছেদ ও বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। কিন্তু তাদের যুদ্ধ ঘোষণার আগেই ফরাসীরা অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই সময় পশ্চিম ফ্রান্সের কৃষকেরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বাইরে থেকে শত্রুর আক্রমণ এবং দেশের মধ্যে বিদ্রোহ এই উভয় সংকটে কঠোর শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন হল। বারজন লোককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির হাতে ফ্রান্সের সমস্ত লোকের উপর যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা দেওয়া হল। এই কমিটি কেবল ভয় দেখিয়ে দেশ শাসন করত বলে এদের শাসনকালকে বলা হয় **সন্ত্রাসের রাজত্ব**।

রোবস্‌পিয়ের

সন্ত্রাসের রাজত্ব ঃ জ্যাকোবিন দলের নেতা ছিলেন **রোবস্‌পিয়ের**। যদি কোন লোক তাঁর শাসনের বিরোধিতা করত বা যাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হত, তাকেই হত্যা করা হত। এই সময়, ডাঃ **গিলোটিন্‌** নামে একজন বিপ্লবী একটি হত্যাযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই হত্যাযন্ত্রের নাম হয়েছিল **গিলোটিন্‌**। এই গিলোটিন্‌ দিয়ে বহু লোককে হত্যা করা হল। অবশেষে, রোবস্‌পিয়েরের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং সকলে মিলে রোবস্‌পিয়েরকেই গিলোটিনে হত্যা করল।

রোবস্‌পিয়রের পরে দেশের শাসনভার পাঁচজন ডিরেক্টারের হাতে দেওয়া হল।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এদের শাসনকাল চার বছর ধরে চলেছিল। এই সময়ে দেশের শাসনব্যাপারে ও বৈদেশিক নীতিতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সেই সুযোগে **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট** নামক এক তরুণ ফরাসী সেনাপতি ফ্রান্সের প্রথম **কন্‌সাল** নিযুক্ত হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন। এই সময় থেকে ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসী গণতন্ত্রের অবসান হল এবং নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ও সাম্রাজ্য স্থাপন আরম্ভ হল।
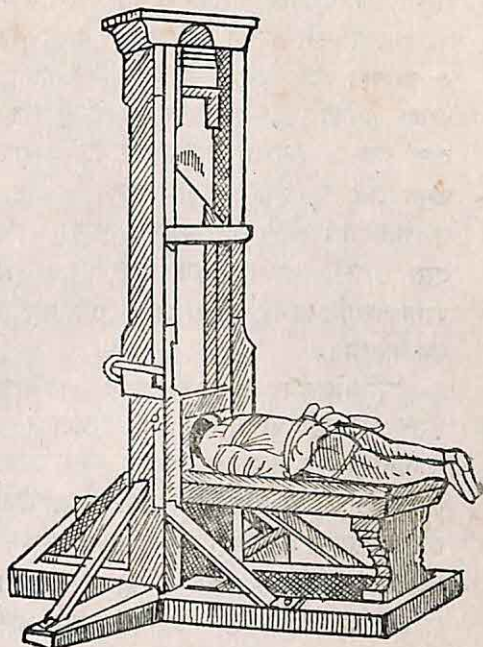
গিলোটিন

বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ন ঃ ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপের অজকসিও (Ajaccio) শহরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম হয়। তিনি কম বয়সেই যোদ্ধা হবার আকাঙ্ক্ষায় প্যারিসে যান। সেখানে তিনি কিছুদিন সামরিক শিক্ষা লাভ করে গোলন্দাজ সৈন্যদলে যোগ দেন। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তিনি প্রথম দেশসেবার সুযোগ পান। ফ্রান্সের টুলোঁ শহরে প্রজাতন্ত্র-বিরোধীদের সাথে যোগ দিয়ে ইংরেজ সৈন্য ফরাসীদের বিপ্লব দমন করবার উদ্যোগ করলে নেপোলিয়ন গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে তাদের বিতাড়িত করেন (১৭৯৪ খ্রীঃ)। দু' বছর পরে জাতীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধবাদী প্যারিসের একদল দাঙ্গাকারী জনতাকে তিনি গুলিবর্ষণ করে হটিয়ে দেন। নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালী অভিযানে অসামান্য শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি অল্প বয়সে রুশোর বিশেষ ভক্ত হয়ে ওঠেন।

নেপোলিয়ন মিশর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই তিনটি শক্তিসংঘ দ্বিতীয়বার মিলিত হয়ে ফরাসী বিপ্লবীদের ক্ষমতা উচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হল। এই দুরবস্থায় কনসালদের ক্ষমতা একেবারে খর্ব হয়ে গেল। নেপোলিয়নের অনুগত সেনাদল ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিল। তিনিই তখন ফ্রান্সের প্রধান কর্তা হলেন। তাঁর কৃতিত্বে রাশিয়া ফ্রান্সের বিরোধিতা ত্যাগ করল। ইটালীতে ফ্রান্সের পূর্ব আধিপত্য বজায় রইল। অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে ফ্রান্সের পদানত হতে বাধ্য হল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে **অ্যামিয়েন্সের সন্ধি** হয়। এই সুযোগে নেপোলিয়ন দেশের শাসন সংস্কারে মন দিলেন।

নেপোলিয়নের শাসন-সংস্কার ঃ একদিকে অসীম বীরত্ব, অন্যদিকে শাসন-সংস্কারের কৃতিত্বে নেপোলিয়ন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। দেশের আইন-কানুনগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য নেপোলিয়ন বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সহায়তায় যে আইন-প্রণয়ন করেন তা **কোড নেপোলিয়ন** নামে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কোড নেপোলিয়নের মূল সূত্র ছিল দেশে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন। তিনি দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ফ্রান্সে ব্যাংক স্থাপন করেন। তিনি দেশ-বিদেশে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করান এবং বন্দরগুলিকে উন্নত করে তোলেন। তাঁর সময়ে সমগ্র প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চা দেশকে শিক্ষায়-দীক্ষায় অতি উন্নত করে তোলে।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিদ্রোহ ঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নেপোলিয়ন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। ক্রমেই ক্ষমতার নেশা তাঁকে উন্মত্ত করে তুলল। তিনি জার্মানির দক্ষিণ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করে সংঘবদ্ধ করলেন। হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া তাঁর পদানত হল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রাশিয়া আক্রমণ করলেন। কিন্তু রাশিয়ায় তাঁর চরম পরাজয় ঘটল (লিপ্‌জিগের যুদ্ধ, ১৮১৩ খ্রীঃ)। তাঁর ছয় লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীর মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফ্রান্সে ফিরে এল।

রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়াও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রাশিয়া ও হল্যাণ্ড বিদ্রোহ করল। সুইডেন বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে লাগল। ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আগে থেকেই চলছিল। এভাবে সংঘবদ্ধ ইউরোপের রাজাদের সাথে নেপোলিয়নকে বারবার যুদ্ধ করতে হয়। সম্মিলিত শক্তির কাছে নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করা হল। ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুইকে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসান হল। নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে এগারো মাস থাকার পর

গোপনে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ফরাসী জনসাধারণ তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের ঠিক একশ' দিন পরে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া ও বেলজিয়ামের সমবেত সৈন্যদের হাতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটল। এবার তাঁকে সেণ্ট হেলেনার সুদূর দ্বীপে বন্দী রাখা হল। সেখানে ক্যান্সার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে **ভিয়েনা সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় এবং রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

ফরাসী বিপ্লবের দানঃ ফরাসী বিপ্লবের পরেও ফ্রান্সে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজতন্ত্র বজায় থাকে। দীর্ঘদিন সংগ্রাম করার পর অবশেষে ফ্রান্সের বিপ্লবী শক্তি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র ও সমাজে এক নতুন যুগ উপস্থিত হল। বিপ্লবের ভাবধারা ফ্রান্সে রাজশক্তির স্বেচ্ছাচার ও অভিজাত শ্রেণীর অধিকারের মূলে আঘাত করল। তখনকার সময়ে ফরাসীদের ন্যায় ইউরোপের জনসাধারণও নানারূপ অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী শুনে তারাও নিজেদের অধিকার ও অবস্থার উন্নতিলাভের জন্য সচেতন হয়ে উঠল। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল, সেই রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঐ সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে বিদ্যমান ছিল। তাই ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা ইউরোপের মানুষের মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে এক নতুন পথে পরিচালিত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আর এক স্থায়ী ফল হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, যার সার্থক ফল হল ইটালী ও জার্মানির জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কারণ কি? ২। জর্জ ওয়াশিংটনের সম্বন্ধে কি জান বল। ৩। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সাফল্যের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ৪। শিল্প-বিপ্লব বলতে কি বোঝ? এর ফল কি? ৫। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর। ৬। ফ্রান্সে বিপ্লব হওয়ার কারণ কি? ৭। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও। ৮। নেপোলিয়নের কথা কি জান বল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ইংলণ্ডে বয়নশিল্পের কিভাবে উন্নতি হয় এবং এর ফল কি হয়েছিল? ২। কয়লা ও লোহ শিল্পের কিভাবে উন্নতি হয়? ইংলণ্ডে কৃষিকার্যে কিভাবে যুগান্তর উপস্থিত হয়? যানবাহনের কিভাবে উন্নতি হয়? ৩। ফরাসী বিপ্লবে ফরাসী দার্শনিকদের আবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪। ফরাসী বিপ্লবের সূচনা

কিভাবে হল? ৫। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের বিবরণ দাও। ৬। ফরাসী বিপ্লবের দান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) বোস্টন টী পার্টি কথাটির অর্থ কি? (খ) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ কোন্ শহরে ঘোষিত হল? (গ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পথিকৃৎ কে ছিলেন? (ঘ) শিল্প-বিপ্লব কথাটির অর্থ কি? (ঙ) যন্ত্র-বিপ্লব কথাটির অর্থ কি? (চ) জেমস্ ওয়াট কি আবিষ্কার করেন? (ছ) পিচ-ঢালা রাস্তা তৈরীর উপায় কে আবিষ্কার করেন? (জ) কারখানা আইন কি? (ঝ) ফ্রান্সের কোন্ শহরকে সভ্য জগতের রাজধানী বলা হয়? (ঞ) জ্যাকোবিন দলের নেতার নাম কি? (ট) রোব্সপিয়ের কে ছিলেন? (ঠ) ওয়াটারলুর যুদ্ধে কার পতন হয়েছিল?

২। **যে উত্তরটি তোমার ঠিক মনে হয়, সেটি '√' চিহ্ন দাও ঃ**
আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কারণ কোন্‌টি—

(ক) ব্রিটিশ সরকারের স্ট্যাম্প অ্যাক্টের দ্বারা ঔপনিবেশিকদের অত্যাচারের চেষ্টা।

(খ) ঔপনিবেশিকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

(গ) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি ছিল না।

(ঘ) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ সরকারের হাতে শোষিত হত।

৩। **সঠিক উত্তরটি রেখে অন্যগুলি বাদ দাও ঃ**

(ক) স্পিনিং জেনী আবিষ্কার—জন কে, হারগ্রীভস্, ক্রম্পটন।

(খ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রথমে তৈরী করেন—আর্করাইট, জন ফিট, জেমস্ ওয়াট।

(গ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু ও ভেড়া প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন—বেকওয়েল, জেথরো টাল, ম্যাকাডাম।

(ঘ) বাষ্পীয় জাহাজ প্রথমে নির্মাণ করেন—ক্রম্পটন, স্টিফেনসন, কার্টরাইট।

ঘটনাপঞ্জী

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে—হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনী আবিষ্কার।
১৭৬৯ ,, —জেমস্ ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার।
১৭৭৬ ,, —আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।
১৭৮৩ ,, —ইংরেজদের আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে—কার্টরাইটের কলের তাঁত আবিষ্কার।
১৭৮৯ " —বাস্তিলের পতন, ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ।
১৭৯৩ " —ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড।
১৭৯৪ " —রোবস্‌পিয়েরের প্রাণদণ্ড।
১৮০৪ " —নেপোলিয়নের সম্রাট পদ লাভ।
১৮১৪ " —নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ।
১৮১৫ " —ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ও নির্বাসন; ভিয়েনা শান্তি বৈঠক।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরে।
২। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের পথিকৃৎ ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন।
৩। কার্টরাইট ও জেমস্ ওয়াট যথাক্রমে পাওয়ারলুম ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।
৪। বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার করেন হেনরী বেল।
৫। স্টেটস্ জেনারেল পরে জাতীয় মহাসভারূপে ঘোষিত হয়।
৬। জ্যাকোবিন দলের নেতা ছিলেন রোবস্‌পিয়ের।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উন্মেষঃ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম ফল হল ইউরোপের প্রায় সব দেশে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উন্মেষ। প্রতিটি জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে এবং সেই রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছা অনুসারে গঠিত হবে। এক ভাষা, এক কৃষ্টি ও এক ঐতিহ্য থাকলে জাতি গঠিত হয়—এই ধরনের জাতীয়তাবোধ ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ স্পেন, রাশিয়া ও পর্তুগালের জনগণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রবাদী আন্দোলন সুরু হয়। কোথাও বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও দাস প্রথার অবসান ঘটান, কোথাও তাদের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান, আবার কোথাও বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা। ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডী নিজের দেশের ও দক্ষিণ আমেরিকার জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদ বনাম প্রতীক্রিয়াশীলশক্তি ঃ নেপোলিয়ন যুদ্ধ করে

প্রায় সমগ্র ইউরোপের উপর অধিকার স্থাপন করেছিলেন। বহু রাজ্যের রাজ্যসীমা সাময়িককালের জন্য লোপ পেয়েছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর স্বভাবতই সে সব রাজ্য পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন উঠল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী দেশগুলির প্রতিনিধিরা এজন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে সমবেত হলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসেলরী, ফ্রান্সের মন্ত্রী টেলিরা ও অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও বিপ্লব-প্রসূত অবস্থাকে অস্বীকার করে আবার স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ফিরিয়ে আনা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা "ন্যায্য অধিকার", "শক্তিসাম্য" ও "ক্ষতিপূরণ"—এ তিনটি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে চললেন। ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড এবং ইটালীর ও জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে পুরোন রাজবংশের শাসন আবার কায়েম করা হয়। পোপও তাঁর মধ্য ইটালীর রাজ্য ফিরে পান।

ন্যায্য নীতি অনুসরণ করতে গিয়েও তাঁরা অন্যায়ভাবে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আর নরওয়েকে জুড়ে দিলেন সুইডেনের সঙ্গে। ফ্রান্স যাতে ভবিষ্যতে আবার শক্তিশালী না হতে পারে সেজন্য তাঁরা এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। ইউরোপের পুনর্বণ্টনে প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে এমনভাবে শক্তিসাম্য নীতি প্রয়োগ করলেন যাতে করে শক্তি অপরাপর দেশের তুলনায় বেশী না হয়।

বিজয়ী দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে প্রতিনিধিরা অন্যান্য দেশের কতক অংশ কেড়ে নিলেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের স্বার্থে ইউরোপের পুনর্বণ্টন করলেন। তাঁরা বিপ্লবের প্রভাব, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বিপ্লবের পূর্বেকার প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃ স্থাপন করলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আতঙ্ক রাষ্ট্রনায়কদের পেয়ে বসেছিল। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ফরাসী বিপ্লবকে এক অধর্মীয় ঘটনা বলে মনে করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাজাদের নিয়ে "পবিত্র মৈত্রী সংঘ" নামে এক সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা ছিল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমূলক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জারের মৃত্যু হলে এই সংস্থার অবসান ঘটে।

এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র-নায়করা ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা দমন করার জন্য এক ইউরোপীয় সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই ব্যাপারে অগ্রণী হন

অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক। তাঁর চেষ্টায় অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক "**চতুঃশক্তি মিতালী**" বা "**মৈত্রী সংঘ**" গঠিত হয়। এই মিতালীর **লক্ষ্য ছিল** (১) বিপ্লবের পূর্বেকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপন করা, (২) **গণতান্ত্রিক বা** জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা, (৩) ইউরোপের শান্তি রক্ষা করা, (৪) ফ্রান্সের আক্রমণের প্রতিরোধ করা—এইভাবে চতুঃশক্তি মিতালী বা ইউরোপীয় শক্তি-সমবায় আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা ও তার পরিণতিঃ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক কেবল চতুঃশক্তি মিতালি বা ইউরোপীয় শক্তি-সমবায়ের মাধ্যমেই নয়—অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যও নানা প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিক ছিলেন অষ্টাদশ শতকের রক্ষণশীলতার প্রতীক ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর-দত্ত। রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ। রাজার পরেই অভিজাতদের স্থান। রাজার শাসন মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে ভগবান পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তিনি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তা-বাদী চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন। নানা জাতি-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার যাতে এই চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেজন্য তিনি নানা প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। বিদেশ থেকে পুস্তক আমদানির ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মেটারনিক ছিলেন জার্মান কনফেডারেশনের সভাপতি। জার্মান কনফেডারেশনের মাধ্যমে মেটারনিক জার্মান জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক আন্দোলনের গতিরোধের চেষ্টা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ এবং আরও নানা প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মেটারনিক ইটালীতে তাঁর নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করতে পারেননি। পশ্চাদ্‌প্রসারী মেটারনিক যুগের ভাবধারাকে অস্বীকার করে কৃত্রিম উপায়ে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে নূতন করে বিপ্লব দেখা দেয়। মেটারনিকের দ্রুত কর্মতৎপরতায় তা দমিত হয়। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের দুর্বারগতি রোধ করা মেটারনিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই বিপ্লব জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার ফলস্বরূপ। এইভাবে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হল।

মেটারনিক

ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)।
[ইটালী ও জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ।]

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কৃত্রিম উপায়ে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের বিস্তারের ফলে বুরবোঁ বংশের শাসনের অবসান হয়। ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের 'ন্যায্য অধিকার নীতি' কার্যকর থাকে না। ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিয়েনা সম্মেলনের 'শক্তি-সাম্য নীতি' অনুসারে বেলজিয়ামকে জোর করে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জুলাই বিপ্লবের পরে বেলজিয়ামে বিপ্লব দেখা দেয়। বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করে। ভিয়েনা সম্মেলনের শক্তি-সাম্য নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বিদ্রোহ মেটারনিকের দমন নীতির সাহায্যে সাময়িকভাবে দমন করা হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে সে দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে দ্বিতীয়বার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানি, ইটালী এবং ইউরোপের নানা দেশেই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অস্ট্রিয়ার বিদ্রোহের ফলে মেটারনিক স্বয়ং স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইউরোপে মেটারনিক ব্যবস্থার অবসান হয়। এই প্রসঙ্গে ইটালী ও জার্মানির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশদভাবে আলোচনার দাবি করতে পারে।

ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা : প্রাচীন যুগে রোম যখন পৃথিবী শাসন করত তখন ইটালী রোমের গর্বে গর্ববোধ করত। কিন্তু রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইটালীর গুরুত্ব লোপ পেল। মধ্য যুগে এর কতকাংশ জার্মান সাম্রাজ্যের অধীন হয়। বাকি অংশে বিভিন্ন রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। নেপোলিয়নই সর্বপ্রথম বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ইটালীকে একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত করে একই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়নের পতনের পরে ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ইটালীর প্রতি অবিচার করেন। তাঁরা নেপোলিয়নের ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে ইটালীকে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত করেন। উত্তরাঞ্চলে ভেনিস এবং লম্বার্ডি ছিল প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন। মধ্য-ইটালীতে পার্মা, মোডেনা, টাসকানী প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অধিপতিরা পরোক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের নির্দেশে চালিত হতেন। রোম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল পোপের রাজ্য। দক্ষিণ ইটালীর সিসিলি এবং নেপল্‌সে রাজত্ব করতেন ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজারা। ইটালীর যে একটি মাত্র অঞ্চলে ইটালিয়ানরা রাজত্ব করতেন, তার নাম **পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া।**

ইটালীর জাতীয় আন্দোলন : ইটালী সম্পর্কে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ইটালীবাসীদের মনঃপূত হয়নি। অস্ট্রিয়ার ন্যায় সামরিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ইটালীবাসীদের সরাসরি যুদ্ধ করা কঠিন

ছিল। তাই ইটালীর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় **কার্বোনারি** নামে একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গঠন করে। তারা গোপন হত্যা এবং ষড়যন্ত্রের
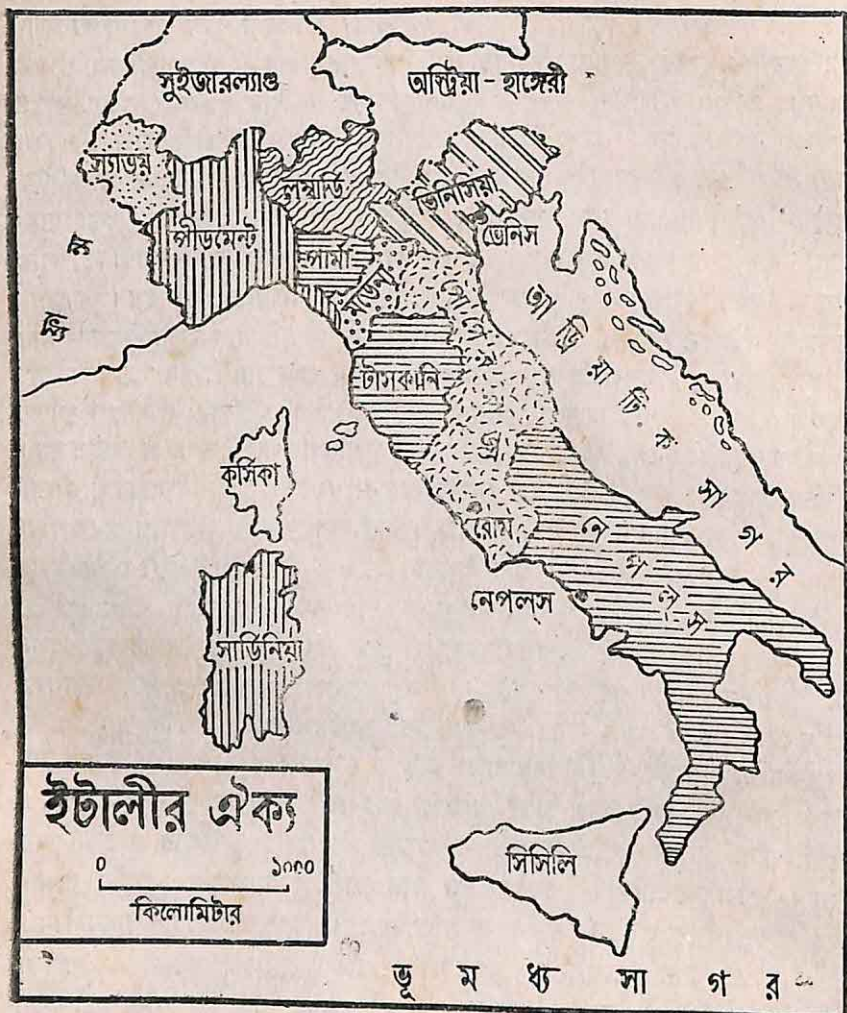
সাহায্যে ইটালীকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

জোসেফ ম্যাৎসিনি ঃ এই সময় ইটালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন **জোসেফ ম্যাৎসিনি** নামে একজন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক। কিভাবে বিদেশী শাসনমুক্ত করে সমগ্র ইটালীকে একটি অখণ্ড সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে তিনি কার্বোনারি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মীপুরুষ। দেশের সর্বত্র

ঘুরে তিনি জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইটালীর যুবকেরা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এদের সাহায্যে তিনি **ইয়ং ইটালী** নামে একটি সমিতি গঠন করলেন।

জোসেফ ম্যাৎসিনি

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের গণ-আন্দোলন ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের জনসাধারণ লুই ফিলিপের শাসন উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই সংবাদে উল্লসিত হয়ে ইটালীর জনসাধারণ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পীডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত করলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির কাছে জাতীয়তাবাদীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

কাউণ্ট কাভুর

কাউণ্ট কাভুরের নেতৃত্ব ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে ইটালীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন **কাউণ্ট কাভুর**। ম্যাৎসিনির মতো তিনিও অখণ্ড ইটালিয়ান রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ছিলেন সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী। তিনি চেয়েছিলেন সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। তিনি প্রথমে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে সার্ডিনিয়াকে একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এরপর তিনি সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। কাভুর জানতেন, অস্ট্রিয়াকে বিতাড়ন না করা পর্যন্ত ইটালীর অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। তিনি আরও জানতেন যে, অস্ট্রিয়ার মতো শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করতে হলে বিদেশী শক্তির সাহায্য অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** শুরু হয়। কাভুর এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁর চেষ্টায় ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়াকে সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এর পর কাভুর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে অস্ট্রিয়া সন্ধি করে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়া সার্ডিনিয়াকে লম্বার্ডি প্রত্যর্পণ করল। সার্ডিনিয়ার লম্বার্ডি অধিকার ইটালীর ঐক্যবদ্ধতার প্রথম সোপান।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে মধ্য-ইটালী, পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা স্থির করল যে, তারা সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হবে।

অতঃপর দক্ষিণ ইটালীর অন্তর্গত নেপলস্ ও সিসিলির অধিবাসীরা বুরবোঁ রাজত্বের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

গ্যারিবল্ডি

গ্যারিবল্ডির বীরত্ব ঃ ম্যাৎসিনির প্রধানতম সহচর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন গ্যারিবল্ডি। ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ—এই ত্রিশ বছর কাল তিনি নানাভাবে ইটালী থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি আইন অথবা কূটনীতির ধার ধারতেন না। কাভুরের সাথে তাঁর বহু বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। তিনি **রেড শার্ট** নামধারী এক বিশাল বাহিনী নিয়ে নেপলস্ ও সিসিলিতে অভিযান চালান। তিনি সেখান থেকে বুরবোঁ শাসনের উচ্ছেদ করে দুটি রাজ্যকে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে সমর্পণ করলেন।

ঐক্যবদ্ধ ইটালী ঃ দক্ষিণ অঞ্চলে সার্ডিনিয়ার প্রভুত্ব স্থাপিত হবার পরে কাভুর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমে ভিনিসিয়া ও পরে রোম ইটালিয়ানদের হস্তগত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল সমগ্র ইটালীব্যাপী অখণ্ড রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে ঘোষিত হলেন। ম্যাৎসিনির জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, কাভুরের সূক্ষ্ম কূটনীতি এবং গ্যারিবল্ডির অসাধারণ বীরত্বের ফলে ইটালীবাসীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সার্থক রূপ লাভ করল।

জার্মানি ঃ জার্মানির অবস্থাও ইটালীর মতই ছিল। নামে তা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অর্থাৎ অস্ট্রিয়া ও স্পেনের অধীন ছিল, আসলে কিন্তু সেখানে বহু ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল আর তাদের মধ্যে কলহ লেগেই ছিল। এই সুযোগে নেপোলিয়ন জার্মান জয় করে, দক্ষিণ জার্মানির ছোট রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জার্মানরা তখন নেপোলিয়নের পদানত হলেও নিজেদের এক জাতি

হিসেবে ভারত শিখল এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বুঝল। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলি আবার জার্মানিকে আগের মতোই খণ্ড খণ্ড করে দিল।
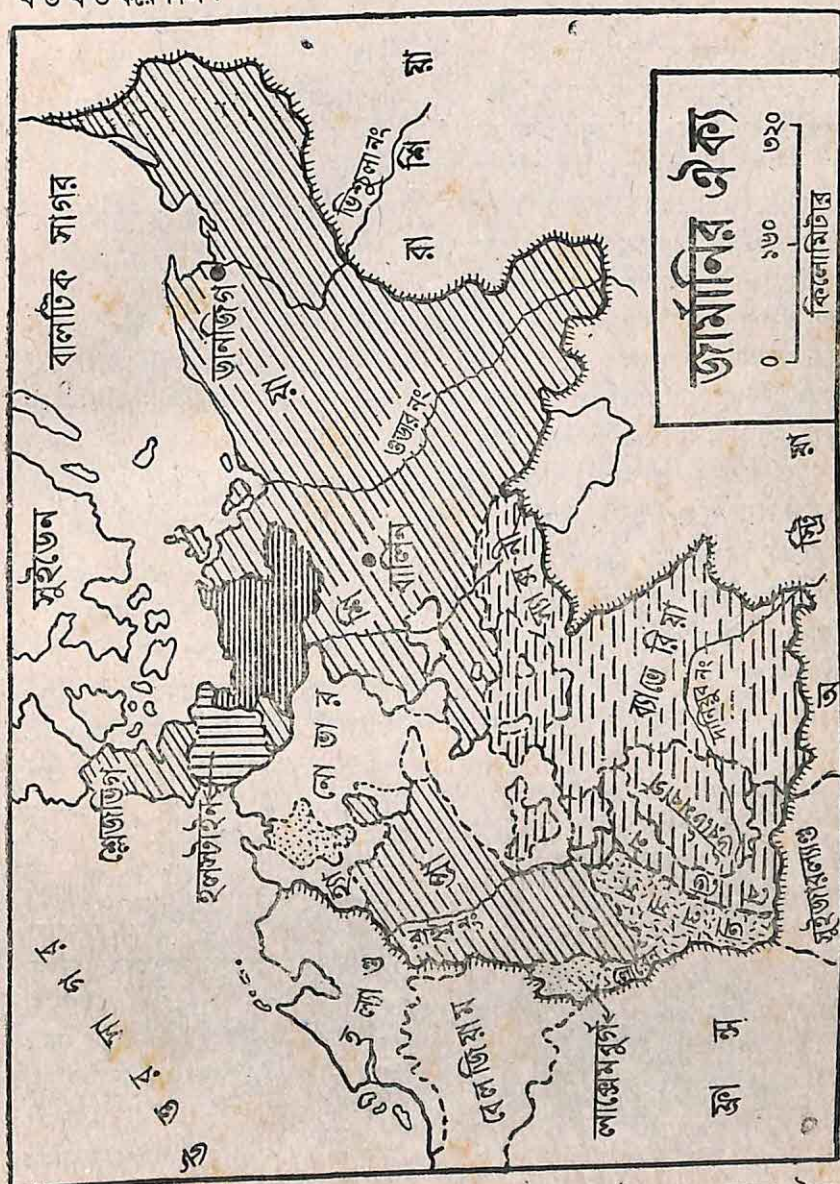
কিন্তু জার্মান জাতি আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইল না। তারা ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করল। দুটি পৃথক ধারা জার্মান জাতিকে ঐক্যের পথে

এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি হল "প্যান-জার্মানিজম" অর্থাৎ জার্মান মাত্রেই একই রাষ্ট্রের অধীন ঐক্যবন্ধ হবে এই আকাঙ্ক্ষা, অপরটি হল "জোলভারেন" নামে এক মুক্তি-সংঘ। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করল **প্রাশিয়া**।

প্রাশিয়া জার্মানির পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত একটি বড় রাজ্য। ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন ইটালীতে সার্ডিনিয়া যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, জার্মানির ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রাশিয়াও সেই ভূমিকা গ্রহণ করল। এখানে **হোহেন্‌-জোলার্ণ** বংশ রাজত্ব করতেন। আগে এঁরা নিজেদের স্বাধীন রাজ্য বলতে পারতেন না। এই বংশের **প্রথম ফ্রেডেরিক** নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

ফ্রেডেরিক প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করে তোলেন। তার পুত্র **দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের (মহান ফ্রেডেরিক)** রাজত্বকালে প্রাশিয়া আরো শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক **সাইলেসিয়া** ও পোল্যাণ্ডের একাংশ জয় করে, প্রাশিয়া রাজ্যকে বিস্তৃত করেন। কিন্তু ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানি আক্রমণ করেন এবং তাঁর চেষ্টায় দক্ষিণ জার্মানিতে একটি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই নেপোলিয়ন প্রাশিয়া অধিকার করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানির ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলিকে সংঘবন্ধ করে ঊনচল্লিশটি রাজ্যে পরিণত করা হয়। তার মধ্যে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াও থাকে। প্রাশিয়ার রাজা **চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়াম** একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেন। এই সময়ে সমগ্র জার্মানিকে একতাবন্ধ করার জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্টে বিভিন্ন জার্মান রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের এক সভা হল। এই সভা প্রাশিয়ার রাজাকে সম্মিলিত জার্মান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট দান করতে চাইল। কিন্তু তিনি পরাক্রান্ত অস্ট্রিয়ার ভয়ে জার্মানির রাজমুকুট গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। তাই অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মানরা প্রাশিয়ার অধীনেই ঐক্যবন্ধ হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের ভাই **প্রথম উইলিয়াম** রাজা হন। এই সময়ে প্রাশিয়ায় একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের আবির্ভাব হয়। তার নাম **বিসমার্ক**।

বিসমার্ক

বিসমার্কঃ বিসমার্ক ছিলেন প্রাশিয়ার একজন ভূস্বামী। সেকালে কূটনীতি বিদ্যায় বিসমার্কের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। প্রাশিয়াকে ঐক্যবন্ধ জার্মানির কেন্দ্র করাই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য। প্রথমেই তিনি প্রাশিয়াকে সামরিক শক্তিতে অজেয় করে তুললেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, "এ যুগের সমস্যাগুলির সমাধান বক্তৃতায় বা

গণভোটের সাহায্যে সমাধান করা যাবে না। সমাধান করতে হবে অস্ত্র এবং রক্ত দিয়ে।" কিন্তু এই ঐক্যসাধনের প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স। বিসমার্ক এই দুই শত্রুর সঙ্গে একই সময়ে যুদ্ধ করা যুক্তিসংগত মনে করলেন না।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহযোগিতায় **ডেনমার্কের** বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ডেনমার্কের রাজা পরাজিত হলেন এবং **শ্লেজউইক** ও **হলস্টেইন**-এর অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই দুটি দেশ ভাগ করে নিলেন। প্রাশিয়ার ভাগে পড়ল শ্লেজউইক ও অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়ল হলস্টেইন। শেষ পর্যন্ত দু বছর পরই হলস্টেইন নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিসমার্ক যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। **প্র্যাগের** সন্ধির ফলে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার আর কোন কর্তৃত্ব থাকল না। প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানিতে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হল।

দক্ষিণ জার্মানির কতকগুলি রাজ্য তখনও ফ্রান্সের অধীনে ছিল। সেগুলিকে মুক্ত করবার জন্য বিসমার্ক চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এ যুদ্ধে ফ্রান্সেরই পরাজয় ঘটল। **ফ্রাঙ্কফুর্টের** সন্ধির ফলে ফ্রান্স প্রায় সমগ্র **আলসাস ও লোরেন** প্রদেশ জার্মানিকে ছেড়ে দিল। বিসমার্ক ফ্রান্সের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু টাকা আদায় করলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে **ভার্সাইয়ের** রাজপ্রাসাদে ফরাসী সম্রাটের প্রসিদ্ধ সভাগৃহে মহাসমারোহে মিলিত জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল। প্রাশিয়ার রাজা **প্রথম উইলিয়াম** জার্মান **সম্রাট** বা **কাইজার** উপাধি গ্রহণ করলেন। জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। এভাবে সমগ্র জার্মানি একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হল।

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর আমেরিকার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল দাসত্ব প্রথা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। উত্তরাঞ্চলে নিগ্রো দাস শ্রমিকদের অপেক্ষা স্বাধীন ইউরোপীয় শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল বেশী। এই কারণে শিল্প-প্রধান উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার অবসান আগেই ঘটেছিল।

কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সেখানে আখ, তামাক, তুলা প্রভৃতির চাষ হত। এই চাষের কাজে নিগ্রো ক্রীতদাসরা খুবই দক্ষ ছিল। কারণ, ক্রীতদাসের কাজে লাগিয়ে অল্প খরচে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। এসব কারণে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

দাসত্ব প্রথার প্রশ্ন ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধও

ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এর ফলে উত্তরাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সব ব্যাপারেই প্রাধান্য ভোগ করে আসছিল। এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের ধারণা ছিল যে, উত্তরাঞ্চলের আধিপত্য থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

আব্রাহাম লিঙ্কন

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি উত্তর ও দক্ষিণের এই বিরোধ চরমে ওঠে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার "রিপাবলিকান" দলের প্রার্থী হিসেবে **আব্রাহাম লিঙ্কন** যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই দলের প্রধান লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল আমেরিকা মহাদেশ থেকে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা। আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন উদারপন্থী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখা ও তার প্রতিরক্ষা ছিল তাঁর অপর আদর্শ। লিঙ্কন কেণ্টাকি প্রদেশে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনও ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সৎ চরিত্রের কথা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির ভয় হল পাছে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটে। সুতরাং এই ভয়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেফারসন ডেভিড-এর নেতৃত্বে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করল। এই সকল রাষ্ট্রগুলি হল সাউথ ক্যারোলিনা, আলাবামা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা ও টেকসাস। তারা একটি আলাদা জাতীয় পতাকাও গ্রহণ করল। তারপর তারা ফোর্ট সাম্‌টার দুর্গটি আক্রমণ করে বসল। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হল। ঐক্য রক্ষার সকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। প্রায় চার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। এমন সময় ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, টেনেসি ও আরকানসাস উপনিবেশও চারটি যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে গেল। আব্রাহাম লিঙ্কন তাতেও দমলেন না। যুদ্ধের প্রথম দিকে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজয় স্বীকার করে। কারণ, উপরের রাষ্ট্রগুলি সৈন্যসংখ্যা, সমরাস্ত্র ও নৌশক্তির দিক ছিল বেশী শক্তিশালী। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির অধিনায়ক জেনারেল "লী" গেটিসবার্গের যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ঐক্যবদ্ধ হল। সেই সঙ্গে গৃহযুদ্ধেরও অবসান হয়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই আব্রাহাম লিঙ্কন এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে লিঙ্কনের জয়লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই গৃহযুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা পায়। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাস-প্রথার অবসান হয়, সকল শ্রেণীর মানুষের স্বাধিকার স্বীকৃত হয়।

ইউরোপের শিল্পায়ন (যান্ত্রিক সভ্যতা)ঃ শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডে প্রথমে শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছিল তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। এইভাবে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি শিল্প-প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং যান্ত্রিক সভ্যতা শুরু হয়। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতকে, ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আর্করাইটের তৈরী করা যন্ত্রপাতি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রবর্তন করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শিল্পী উইলিয়াম ককরিল বেলজিয়ামে প্রথম যন্ত্রপাতি তৈরী করার শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সে লুই ফিলিপের শাসনকালে কলকারখানার বিশেষ প্রসার হয়। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। জার্মানির রাইন অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। জার্মানির সাইলেশিয়ায় প্রচুর কয়লা সম্পদ ছিল। এছাড়া লোহা আনত সুইডেন ও বোহেমিয়া থেকে। জার্মানির ঐক্যের পর বিসমার্ক জার্মানিতে শিল্প বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন, মুদ্রা সংস্কার, শুল্ক সংস্কার করে শিল্পের উন্নতি ঘটান।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রসার শুরু হয়। রাশিয়াও শিল্পে পিছিয়ে থাকেনি। জার প্রথম নিকোলাসের সময় থেকে লোহার উৎপাদন বাড়ে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় দাস-প্রথার অবসান ঘটলে বিদেশী মূলধন আসতে শুরু করে। মুক্ত ভূমিদাসরা শহরে কলকারখানায় শ্রমিকের বৃত্তি নেয়। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাস-এর সময় রাশিয়ায় বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠে। ক্রিমিয়ায় তৈল শিল্প এবং পেট্রোগ্রাডে লৌহ ও বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠে।

শিল্পায়নের ফলাফলঃ শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। অল্পসময়ে বেশী পরিমাণে জিনিসপত্রের উৎপাদন শুরু হলে দাম সস্তা হয়। ইউরোপে শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজের ব্যাপক প্রচলন প্রভৃতি কারণে ইউরোপের দেশগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে তারাও নানাপ্রকার সুযোগ-

সুবিধা আদায়ের জন্য মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। কারখানায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান অধিকার লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। শিল্পের উন্নতির মাধ্যমেই জাপান এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত ও চীন দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মূলে শিল্পের উন্নতি একমাত্র পথ।

শ্রমিক শ্রেণী: যন্ত্রের ও শিল্পের প্রসারের ফলে কারখানার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে সমাজে দুটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। যথা—শিল্পপতি বা কারখানার মালিক ও শ্রমিক। পুঁজিপতিশ্রেণী কলকারখানার মালিকানা দ্বারা প্রভূত মুনাফা লুটে ধনী হতে থাকে। অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী কম মজুরীতে বেশী খেটে দরিদ্র হয়ে অনাহারে মরতে থাকে। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে হত। শ্রমিকদের চাকুরির কোন নিরাপত্তা ছিল না। মালিকরা যখন তখন শ্রমিকদের ছাঁটাই করতেন। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। ফলে, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা আন্দোলন শুরু করল। সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াই ছিল এই সকল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক **লুই** ব্ল্যাঙ্ক প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য কাজের দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে এই দাবি স্বীকৃত হয়নি। ক্রমে কিছু মানবতাবাদী সংস্কারকদের চেষ্টায় শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু আইন রচনা করা হয়। (১) কারখানায় শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা হয়, (২) নারীদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, (৩) শ্রমিকদের সংগঠন ও আন্দোলন করার অধিকার দেওয়া হয়।

কারখানা প্রথার ত্রুটি দূর করা ও শ্রমিকদের স্বার্থে ইউরোপে এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হয় যা সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদনের উপাদান—**জমি, মূলধন** ও শ্রম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। উৎপাদনের যে **মুনাফা** হবে তার ন্যায্য বণ্টন রাষ্ট্রই করবে। এ হল সমাজ তন্ত্রের মূল কথা। **কার্ল মার্কস** ছিলেন সেই সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

কার্ল মার্কস

কাল মার্কস ও এঙ্গেল্স্: কার্ল মার্কস ছিলেন একজন জার্মানবাসী ইহুদি। তিনি জার্মানির বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। জার্মান দার্শনিক **হেগেলের** রচনা মার্কসের আদর্শ ও মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল।

মার্কস আজন্ম একজন বিপ্লববাদী। নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের পর

তিনি ক্রমে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং শ্রমিক সমাজের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্য তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হন। কার্ল মার্কস ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেইখানেই **ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌** নামে একজন জার্মান সমাজতান্ত্রিকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। প্রাশিয়ার সরকারের ইঙ্গিতে ফ্রান্স থেকে মার্কসকে বহিষ্কৃত করা হল। তিনি ব্রাসেলস্‌-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে এঙ্গেলস্‌-এর সহায়তায় মার্কস **কমিউনিস্ট লীগ** নামে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত পুস্তক হল **ডাস ক্যাপিটাল** বা পুঁজি। এই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন।

মার্কস বলেন, মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন-ব্যবস্থার যখন যথেষ্ট উন্নতি হয়নি, তখন সমাজে শোষক ও শোষিতের শ্রেণী থাকাই ছিল স্বাভাবিক। উৎপাদন-ব্যবস্থা যখন অনুন্নত ছিল, তখনও বরাবর বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের সংঘর্ষ ঘটেছে। প্রাচীন যুগে স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস এবং মধ্যযুগে অভিজাত সম্প্রদায় ও ভূমিদাসদের মধ্যে সংঘাত হয়েছে। এই সংঘাত এখনও চলেছে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে। এই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষে পুঁজিপতিরা পরাজিত হবে, দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি শ্রমিকরা আয়ত্ত করবে। দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে দেশের জনসাধারণ। এই মতবাদকে বলা হয় **মার্কসবাদ** বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। মার্কসের চিন্তাধারা বাস্তবে রূপদান করেন **ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌**।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। নেপোলিয়নের পতনের পর জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে কিভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল ?

২। চতুঃশক্তি মিতালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা ও তার পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতালাভের বিবরণ দাও।

৫। জার্মানির ঐক্যলাভের প্রচেষ্টা বর্ণনা কর।

৬। আমেরিকার দাসদের অবস্থা বর্ণনা কর।

৭। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৮। যান্ত্রিক সভ্যতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলি কি ?
২। ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতায় কাভুরের দান কি ?
৩। বিসমার্ক কিভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন ?
৪। আব্রাহাম লিঙ্কন সম্বন্ধে কি জান ?

এককথায় উত্তর দাও :

(ক) অস্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম কি ? (খ) কোন্ তিনটি রাষ্ট্রে বুরবোঁ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? (গ) ইটালীর সন্ত্রাসবাদীরা কি নামে পরিচিত ছিল ? (ঘ) "তরুণ ইটালী" সংঘের সভাপতি কে ছিলেন ? (ঙ) সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ? (চ) প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ? (ছ) প্রাগের সন্ধি কোন্ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? (জ) ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি কোন্ দুই শক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? (ঝ) আব্রাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন ? (ঞ) কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্স্ কে ছিলেন ?

ঘটনাপঞ্জী

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে—ভিয়েনার শান্তি বৈঠক।
১৮৫২ " —কাভুর সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী।
১৮৬০ " —আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
১৮৬১ " —ভিক্টর ইম্যানুয়েলের ইটালীর রাজা উপাধি গ্রহণ।
১৮৬২ " —বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।
১৮৬৩ " —আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথা লোপ।
১৮৬৫ " —আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান ও লিঙ্কনের মৃত্যু।
১৮৭১ " —জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। তরুণ ইটালী দলের সভাপতি ছিলেন **ম্যাৎসিনি**।
২। "রেড্ শার্ট পরা" বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন **গ্যারিবল্ডি**।
৩। সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন **ভিক্টর ইম্যানুয়েল**।
৪। **বিসমার্ক** ছিলেন প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।
৫। কাইজার উপাধি লাভ করেছিলেন **প্রথম উইলিয়াম**।
৬। **আব্রাহাম লিঙ্কন** ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট।

(ক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ ঃ

মাঞ্চু রাজাদের রাজত্বকালে ইউরোপীয় বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই বেশী সংখ্যায় চীনে আসতে আরম্ভ করে। চীনদেশের চীনামাটির বাসনও ছিল অপূর্ব। সেগুলি ইউরোপের অভিজাতদের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হত। ইউরোপীয় বণিকরা চীনামাটির বাসন ইউরোপে নিয়ে যেত। রেশম ও চায়ের ব্যবসাও শুরু হয়েছিল। ইংরেজরা ক্যাণ্টনে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে, তবে তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল আফিমের। তারা চীনে আফিম এনে তার বদলে রূপা নিয়ে যেত। অত্যধিক আফিম খাওয়ার ফলে চীনের লোকজন ধ্বংসের পথে যেতে বসেছিল। তাই মাঞ্চু রাজারা চীনে আফিম বিক্রি বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। ক্যাণ্টন শহরে অনেকগুলি আফিমের বাক্স পুড়িয়ে ফেলা হল। বণিকদের সাবধান করে দেওয়া হল, আফিম বোঝাই কোন জাহাজ যেন ক্যাণ্টনে না আসে। ইংরেজরা কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসা ছাড়তে রাজী হল না। ফলে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধের নাম **অহিফেন যুদ্ধ**। এই যুদ্ধে ইংরেজরা সহজেই জয়লাভ করে।

চীন সম্রাট তাওকুয়াং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে **নানকিং**-এর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। এই সন্ধির ফলে (১) ইংরেজ বণিকরা ক্যাণ্টন, সাংহাই, ফুচো, নিংপো, এ্যাময়—এই পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্য করবার অধিকার পেল। সমগ্র দক্ষিণ চীনে বৃটিশ বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ ঘটল। (২) হংকং ইংলণ্ডের শাসনাধীন হল। (৩) ইংরেজরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনের কাছ থেকে বহু টাকা আদায় করল। যে পাঁচটি বন্দরে ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল, সেই

বন্দরগুলিকে বলা হয় **ট্রিটি পোর্ট** বা **সন্ধির বন্দর**। কিছুদিনের মধ্যে চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, প্রাশিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি এই পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করতে শুরু করে। রাশিয়াও চীন দেশের সাথে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্থাপনের চেষ্টা করে। কিছুদিন বাদে চীনারা বৃটিশের অ্যারো নামে একটি লরচা অর্থাৎ মালবাহী জাহাজকে চোরাই কারবার করার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করল। এই সময়েই এক ফরাসী মিশনারী চীনে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হলেন। এই দুটি ব্যাপারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই যুদ্ধকে বলা হয় **দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ**। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট **টিয়েনসিনের সন্ধি** স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। এই সন্ধির ফলে, (১) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর টাকা আদায় করল। (২) চীনের আরও এগারটি বন্দরে বিদেশীদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হল। (৩) খ্রীষ্টান মিশনারীরা চীনে বাস করবার অধিকার পেল। (৪) চীনের রাজধানী পিকিং-এ বিদেশী রাষ্ট্রদূত রাখবার ব্যবস্থা হল। তাছাড়া চীনকে আরও একটি অপমানজনক শর্তে রাজী হতে হল। কোন ইউরোপীয় চীনে অপরাধ করলে চীনের আইনে তার বিচার করা চলবে না। তার নিজের দেশের বিচারকরা তার বিচার করবেন। এই ব্যবস্থায় অপরাধীরা বিশেষ শাস্তি পেত না; তাই ধর্মপ্রচারকরা এই আইনের সুযোগ নিল। তাছাড়া, ইউরোপীয় বণিকদের ধর্ম, ধন-প্রাণ প্রভৃতি রক্ষার দায়িত্ব চীনা সরকারকে নিতে হল। নির্ধারিত শুল্ক দিয়ে আফিম আমদানি করবার অধিকার স্বীকৃত হল। এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলি চীন দেশে **অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার** লাভ করেছিল।

চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল। তারা যে কেবল চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছিল তা নয়, বিশাল চীন সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করে সাম্রাজ্য বিস্তারও করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানও ইউরোপীয় দেশগুলির মত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। জাপান চীন দেশের কাছ থেকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন দেশের কাছে লুচু দ্বীপগুলি দখল করে। এরপর কোরিয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে চীনের সাথে জাপান যুদ্ধ শুরু করে এবং চীনকে পরাজিত করে। জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশও ক্রমে চীনের ওপর নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে। রাজ্য গ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে চীনে ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক শোষণও শুরু হয়। ইংরেজদের ব্যবসা প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। চীনের বাণিজ্য শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগও বিদেশীদের হাতে চলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য চীনের রাজনৈতিক সংহতি বাজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিল। একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক বলেছিলেন, তরমুজ যেমন খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়, চীন সাম্রাজ্যকেও তেমনভাবে কাটবার

চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সময়েই মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে পারত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব্ স্টেট মিঃ হে-ঘোষিত মুক্ত দ্বার এবং সাম্যের অধিকার নীতির জন্যই এই পরিণতি হয়নি।

এই নীতি অনুসারে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে কোন অধিকার লাভ করলে, অন্য সকল জাতিকেই সেই অধিকার দিতে হত। 'মুক্ত দ্বার' নীতির ফলে চীন কোন বিশেষ দেশের উপনিবেশ না হয়ে আন্তর্জাতিক উপনিবেশে পরিণত হল। মার্কিন সরকারের চেষ্টায় অন্ততঃ সাময়িকভাবেও চীন সাম্রাজ্যের আসন্ন ব্যবচ্ছেদ রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

তাইপিং বিদ্রোহ ঃ মহাচীনের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে **তাইপিং বিদ্রোহ** একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন যখন ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থপর আক্রমণ নীতি থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক বিদ্রোহ দেখা দিল। মাঞ্চু সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য এই বিদ্রোহ শুরু হয়। চীনদেশের কৃষকেরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বিদ্রোহ **তাইপিং বিদ্রোহ** নামে পরিচিত (১৮৫৩ খ্রীঃ) তাইপিং শব্দের অর্থ পরম শান্তি। এই বিদ্রোহের পরম নেতা ছিলেন **হ্যাং-সিন্-চুয়াং**। তিনি নিজেকে স্বর্গ থেকে আগত রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং স্বর্গরাজ্য নামে একটি নূতন রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন। তিনি **নানকিং** দখল করে সেখানে একটি রাজধানী স্থাপন করতেও সমর্থ হলেন। ইউরোপীয় প্রোটেস্ট্যান্টগণ এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। ব্রিটিশ সরকারও তাইপিং বিদ্রোহকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক হলেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন সরকারের পক্ষ গ্রহণ করলে মাঞ্চু সম্রাট তাইপিং বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হলেন। দেশী ও বিদেশী সৈন্যের মিলিত আক্রমণের ফলে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হল।

বিদ্রোহের ফল ঃ তাইপিং বিদ্রোহের ফলে চীনে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য আরো বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অধিকার বিস্তার করতে লাগল। ফ্রান্স আনাম ও টনকিন অধিকার করে নিল। জাপানও চীন দেশের বিরুদ্ধে বিস্তার নীতি অনুসরণ করতে লাগল। অবশেষে কোরিয়া নিয়ে চীন জাপানের যুদ্ধ শুরু হলে জাপানের কাছে চীন পরাজিত হয়।

শত দিবসের সংস্কার ঃ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র জাপানের সাথে বিশাল চীনের পরাজয় চীনদেশের কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রাচীন কনফুসীয় শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন না করলে বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ও রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করলেন। সংস্কারের দাবিদারদের প্রধান অগ্রণী **ক্যাং-ইউ-ওয়েই** ও তাঁর সহযোগী সংস্কারক ছিলেন **সান-ইয়াং-সেন**। তরুণ চীনদল বিশ্বাস করত যে, আমূল

সংস্কার ছাড়া মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। এই প্রচেষ্টাই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের **সংস্কার আন্দোলন** নামে পরিচিত।

এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন, চাকরী পরীক্ষার রদবদল, রেলপথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা, সামরিক ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠন প্রভৃতি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি সংস্কারই প্রাচীনপন্থীদের অতিমাত্রায় বিচলিত করে তুলেছিল। তারা রাজমাতা জু-সি-র শরণাপন্ন হলেন। ইনি ইতিহাসে Empress Dowager নামে পরিচিত। জু-সি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীন পন্থীদের পৃষ্ঠপোষক। পাশ্চাত্য সমাজ তাঁর নাম দিয়েছিল **বৃদ্ধা বুদ্ধ**। সম্রাটের প্রগতিমুখী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য জু-সি রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রচেষ্টায় সংস্কারগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সংস্কার আন্দোলনে জড়িত বহু লোক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। প্রায় শতদিন ধরে সংস্কারের কাজ চলেছিল বলে সংস্কারগুলির নাম দেওয়া হয়েছে **শত দিবসের সংস্কার**।

বক্সার বিদ্রোহ ঃ চীনে সংস্কারকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করবার প্রয়োজন ঘুচল না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনা দেশবাসীর অসন্তোষ **বক্সার বিদ্রোহে** আত্মপ্রকাশ করল। এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা ছিল **ই-হো-তুয়ান** বা ন্যায়ের সুসমঞ্জসমুষ্টি। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ব্যায়াম অনুশীলন করত। ব্যায়াম ক্রিয়া ও সমিতির নাম থেকে বক্সার বা মুষ্টিযোদ্ধা নামের উৎপত্তি। "দেশ রক্ষা কর", "বিদেশী ধ্বংস কর" এই ছিল বক্সারের শ্লোগান। জু-সি-র কৌশলে বক্সারগণ তাদের মাঞ্চু-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে চীন থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমে তারা ইউরোপীয় বণিক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্য চালায়। এই সময়ে বহু বিদেশী বণিক ও পদস্থ কর্মচারীকে বিদ্রোহীগণ হত্যা করতে দ্বিধা করল না। পিকিং এবং টিয়েনসিন্ বক্সারগণের হস্তগত হল। বক্সার বাহিনী কর্তৃক পিকিং-এর বৈদেশিক দূতাবাস অঞ্চল অবরুদ্ধ হল। অবশেষে, এক আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদেশী সৈন্য পিকিং-এ এলে সম্রাজ্ঞী জু-সি ও তাঁর সভাসদরা পিকিং থেকে পালিয়ে গেলেন।

ইউরোপীয় দেশগুলি এই বিদ্রোহের জন্য চীন থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করল। বক্সার বিদ্রোহের পর চীনের অখণ্ডতা বজায় থাকল; কিন্তু পিকিং-এ বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হল।

চীনের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ বক্সার বিদ্রোহ দমন করা হল, কিন্তু যে জাতীয়তাবোধ এর মূল কারণ তার ধ্বংসসাধন সম্ভব হল না। রাজ-দরবারে সংস্কারপন্থীদের প্রতিপত্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাছাড়া ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় দেখে চীনে আবার সংস্কারের কথা উঠল।

এই অবস্থায় বিধবা সম্রাজ্ঞী সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করে মাঞ্চুবংশকে রক্ষা করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হল। পরীক্ষা গ্রহণের বিধি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হল। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢেলে গড়া হল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের মন্ত্রিপরিষদ আধুনিক নীতিতে গঠিত হল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখবার জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠানো হল। রেলপথ নির্মিত হল এবং আধুনিক পদ্ধতিতে নৌবহর ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হল। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল না। ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ না কমে দিনের পর দিন বেড়েই চলল। বক্সার বিদ্রোহের পর থেকে মাঞ্চু শাসনের অবসান ঘটানো বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ চীনদেশের অনেকেই আভ্যন্তরীণ সংস্কারে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও দ্রুত এবং আরও বেশী অগ্রসর হতে চাইল। তারা দেখল যে, দেশের প্রকৃত উন্নতি করতে হলে প্রাচীন রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে হবে। এই সময়ে চীনে আর একদল শক্তিশালী তরুণ আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারাকে স্বীকার ও গ্রহণ করে, পাশ্চাত্য রীতিতেই স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। কিন্তু চীনের এই তরুণদল বিদেশীদের থেকে মাঞ্চু রাজবংশকেই চীনের দুর্দশার জন্য বেশী দায়ী করলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে এক বিপ্লব হল এবং প্রাচীন রাজবংশের পতন ঘটল ; পরের বছর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন **সান-ইয়াৎ-সেন**। ক্যান্টনের অদূরে কোয়ানটুং প্রদেশের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে সান-ইয়াৎ-সেনের জন্ম হয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর দাদা হাউই দ্বীপে চলে যান কিছুদিন বাদে সান-ইয়াৎ-সেনও সেখানে চলে যান। সেখানে তিনি একটি খ্রীষ্টান বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে, সেখান থেকে হংকং যান এবং ডাক্তারি পাস করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে চীনের জাতীয় দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই দলকে বলা হয় **কুয়োমিণ্টাং**। এই দলের আদর্শ ছিল তিনটি—**স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জীবিকার সংস্থান।** এই দলের চেষ্টায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় বিদ্রোহ দেখা দিল। শীঘ্রই এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল মধ্য এবং দক্ষিণ চীনে। বিপ্লব চলাকালীন সময় সান-

সান-ইয়াৎ-সেন

ইয়াৎ-সেন আমেরিকায় ছিলেন। বিপ্লবীরা সান-ইয়াৎ-সেনকে চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে সম্রাট **ইউয়ান-সি-কাই** বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মাঞ্চুবংশে শেষ **সম্রাট সুয়াং তুং** স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলেন। একটি সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করবার ভার পড়ল সম্রাট **ইউয়ান-সি-কাই**-এর উপর। এইভাবে বিদ্রোহীরা জয়ী হলেন। চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। সান-ইয়াৎ-সেন এতদিন চীনের বাইরে থেকেই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এসে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হলেন।

জাপানের অভ্যুদয় (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) : ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানের অভ্যুত্থান বিশ্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চীনের মত জাপানেরও বিদেশীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। জাপানের শাসনকর্তা ছিলেন **মিকাডো** বা সম্রাট। কিন্তু জাপানের আসল শাসন ক্ষমতা ছিল **সোগুন** নামে সেনাপতি বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সোগুনের পরেই ছিল **ডাওমিও** বা সামন্তরা। এঁরা স্বাধীনভাবেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। সামন্তদের অনুচরদের বলা হত **সামুরাই**। এরা ছিল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। সমাজের সব চেয়ে নীচে ছিল অধিকারহীন কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা।

জাপানী সভ্যতা চীনা-সভ্যতার কাছে ঋণী ছিল। চীনাদের মত জাপানীরাও বিদেশীদের ঘৃণার চোখে দেখত। তবুও পর্তুগাল, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের বণিকরা জাপানে আসে এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা জাপানে আসতে আরম্ভ করেন। জাপানীদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—দেশাত্মবোধ ও দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন। তাদের ধর্ম **সিণ্টোবাদ** ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধও শেখাত। কিন্তু কিছু জাপানী খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে জাপানে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুতরাং জাপানে বিদেশীদের প্রবেশ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়।

এইভাবে জাপান বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল। এদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলি দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হয়। এই কারণে মার্কিন সরকারের নির্দেশে মার্কিন সেনাপতি **কমোডোর পেরি** (১৮৫৩ খ্রীঃ) তাঁর যুদ্ধ জাহাজগুলি নিয়ে জাপানের বন্দরে ঢুকে পড়েন। তিনি জাপানের সম্রাটের নিকট জাপানের বন্দরগুলি মার্কিন বাণিজ্যের জন্য খুলে দিতে বলেন। পেরির আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রণতরীগুলি দেখে জাপানীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের দুর্বলতা বুঝে আমেরিকা তার কাছ থেকে কয়েকটি সুবিধা আদায় করে নিল। জাপান আমেরিকার নাবিকদের জন্য নাগাসাকি ও আরো দুটি বন্দর ছেড়ে দিতে রাজী হল। জাপানের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় ইংলণ্ড,

ফ্রান্স ও অন্যান্য বিদেশীরাও জাপানের কাছ থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়।

জাপানের বিপ্লব (১৮৬৭ খ্রীঃ) : ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে জাপানের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন শুরু হল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে জাপানীরা সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পারল। বিদেশীদের হাতে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ফলে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সোগুন পরিবারের হাত থেকে সম্রাটকে মুক্ত করা হয়। সোগুন, ডাইমিও ও সামুরাইদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় এবং সম্রাট মুৎসোহিটোকে সসম্মানে ইয়েডো নগরে নিয়ে এসে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। সম্রাটের ক্ষমতায় এই ফিরে আসাকে **"মেইজি সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা"** বলা হয়। এই বিপ্লবের ফলে সম্রাট রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ফিরে পান।

জাপানের পাশ্চাত্যকরণনীতি : ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর জাপানীরা এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করে। সুতরাং কেন্দ্রীয়করণ আন্দোলন শুরু হল। সোগুনের পদ তুলে দেওয়া হল, সামুরাই তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করল এবং সামন্ত প্রথার অবসান ঘটল।

মুৎসোহিটো

এর পর জাপানের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে পাশ্চাত্যকরণের নীতি অনুসৃত হল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রয়োগ করে জাপান এক নূতন দেশে পরিণত হল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার অনুকরণে জাপানে এক নূতন সংবিধান চালু করা হয়। এই সংবিধানে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়। সম্রাটকে সাম্রাজ্যের প্রধান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়। শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত এক সংস্থা বা "ডায়েট" গঠন করা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাপানে এই প্রথম যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হল। তার সঙ্গে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস ও বন্দর প্রভৃতি নির্মাণের ফলে জাপানে শিল্প-বিপ্লবের উদ্বোধন হল। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের

প্রসার ঘটল। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হল। প্রজাস্বত্ব আইন রচনা করে কৃষকদের জমির মালিকানা দেওয়া হয়। মুদ্রানীতির সংস্কার করা হয় ও ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সামাজিক জীবনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। জাপানী ছাত্ররাও দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যেতে থাকে। ইউরোপীয় বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করা হয়। ধর্ম সম্বন্ধে উদার নীতি প্রবর্তিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী আইন-কানুন বাতিল করা হয়।

সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুকরণ করা হল। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও জাতীয়করণ করা হল। প্রাশিয়ার অনুকরণে জাপানের সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করা হয়। ইংলন্ডের অনুকরণে জাপানে একটি নৌবাহিনী গঠন করা হয়।

এই সকল সংস্কারের ফলে জাপান আধুনিকতার পথে অগ্রসর হল এবং সেই সঙ্গে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের পদ্ধতিও অনুসরণ করল।

জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করতে গিয়ে জাপান যে কেবল তার ভাল দিকটাই গ্রহণ করল তা নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলির মত সেও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। অতি অল্পদিনের মধ্যে জাপান শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হল। প্রতিবেশী চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপান নিজের সাম্রাজ্য বাড়াবার জন্য বারবার নির্লজ্জ পন্থা অবলম্বন করল। কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে চীন জাপানের কাছে পরাজিত হল। **সিমনো-সেকির সন্ধিতে** কোরিয়ার ওপর থেকে চীনের আধিপত্যের অবসান ঘোষণা করা হল। চীন জাপানকে ফরমোজা দ্বীপটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পেল এবং সেই অত্যধিক আত্মবিশ্বাস থেকেই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী জীবনের সূচনা হল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে সমতার ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে ইংলন্ড সন্ধি স্থাপন করল। এই সন্ধিতে জাপানের মর্যাদা ও শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল।

জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। এইজন্য মাঞ্চুরিয়াকে বলা হত চীনের শস্যভান্ডার ; কিন্তু বক্সার বিদ্রোহের পর মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার অধিকারে গিয়েছিল। রাশিয়া কোরিয়ায়ও প্রভাব বিস্তার করতে চাইল। রাশিয়ার অভিসন্ধি দেখে জাপান চাইল কোরিয়ায় নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে। ফলে, রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হল (১৯০৪-০৫)। **মুকডেনের** স্থলযুদ্ধে ও **সুশিমার** নৌযুদ্ধে রাশিয়া জাপানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় **পোর্টসমাউথের** সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের

অবসান হল। এই সন্ধিতে কোরিয়ার ওপর জাপানী প্রভুত্ব স্বীকৃত হল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে গেল। জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ অংশ লাভ করল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এই প্রথম একটি এশীয় শক্তি ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হল। জাপান এখন থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে এশিয়ায় নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হল। অপরদিকে, জাপানের এই উন্নতি সমগ্র এশিয়ায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি করল।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে কোন লাভ হল। কেননা, জাপান সাম্রাজ্যবাদের পথ অনুসরণ করল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সরাসরি কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

তারপরেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। জাপান ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপানের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সুযোগে চীনে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা এবং যুদ্ধের পরে এশিয়ার জার্মান অধিকৃত কিয়াওচাও এবং শাণ্টুং প্রদেশ দখল করা। যুদ্ধ শেষে মিত্র শক্তি জাপানকে এই সকল স্থানের অধিকার অর্পণ করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আট-চল্লিশ ঘণ্টার মেয়াদে কুখ্যাত **একুশ দফা দাবি** পূরণের জন্য চীনের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে এবং চীনকে তা পূরণ করতে বাধ্য করে। তখন চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ইউয়ান-সি-কাই। তিনি একুশটি দাবির অধিকাংশই মেনে নিলেন। ফলে, শাণ্টুং জাপানীদের অধিকারে থাকল। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল এবং চীনের উপর একপ্রকার জাপানের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা হল। চীনের স্বাধীনতা বিনষ্ট করাই ছিল এই দাবির উদ্দেশ্য। এইজন্য একুশ দফা দাবিকে **এশিয়ার মনরো নীতি** নামে অভিহিত করা হয়েছে। এইভাবে জাপান চীন দেশের বিরুদ্ধে অপ্রতিহতভাবে বিস্তারনীতি অনুসরণ করে চলল।

অনুশীলনী

(ক) চীন

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। চীনদেশে অহিফেন যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধের ফল কি হল?
২। চীনে তাইপিং বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
৩। সান-ইয়াৎ-সেন সম্বন্ধে কি জান?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। টিয়েনসিনের সন্ধির ফলাফল কি ?

২। শত দিবসের সংস্কার কি ?

৩। চীনদেশের বক্সার আন্দোলন ও তার ফলাফল কি হয়েছিল ?

৪। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) অহিফেন যুদ্ধ কোন্ দুই শক্তির মধ্যে হয়েছিল ? (খ) কোন্ চীন সম্রাট নানকিং-এর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন ? (গ) অতি রাষ্ট্রিক অধিকার কথাটির অর্থ কি ? (ঘ) ট্রিটি পোর্ট কথাটির অর্থ কি ? (ঙ) এ্যারো কি ? (চ) মুক্তদ্বার এবং অধিকার ও সাম্যের নীতি কে ঘোষণা করেছিলেন ? (ছ) তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন ? (জ) বৃদ্ধা-বুদ্ধ কে ছিলেন ? (ঝ) কুয়োমিণ্টাং দলের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

ঘটনাপঞ্জী

১৮৩৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দে—প্রথম অহিফেন যুদ্ধ।
১৮৫৬ " —দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ।
১৯০০ " —বক্সার যুদ্ধ।
১৯১১ " —মাঞ্চু রাজবংশের পতন।
১৯১২ " — চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। **অহিফেন** যুদ্ধ হয়েছিল চীন ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে।

২। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সম্রাট ছিলেন **তাও কুয়াং**।

৩। যে পাঁচটি বন্দরে ইংরেজরা বাণিজ্য করার অধিকার পেল, তাকে বলা হয় **ট্রিটি পোর্ট**।

৪। **মিঃ হে** ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী।

৫। তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন **হাং-সিন চুয়াং**।

৬। Emprees Dowager ছিলেন চীনের রাজমাতা **জু-সি**।

৭। বক্সার বিদ্রোহের উদ্যোক্তা ছিল ই-হো-তুয়ান বা ন্যায়ের সুসমঞ্জসমুষ্টি।

৮। কুয়োমিণ্টাং দলের আদর্শ ছিল—**স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জীবিকার সংস্থান**।

(খ) জাপান

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। জাপানে নবযুগের সূচনা কিভাবে হল ?

২। জাপানী পাশ্চাত্যকরণ নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। জাপানে কিভাবে বিদেশীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করেছিল ?

২। নবযুগের ফলে জাপানের অগ্রগতির বিবরণ দাও।

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) জাপানের রাজাকে কি নামে ডাকা হত ? (খ) জাপানের প্রকৃত শাসক কে ছিলেন ? (গ) কমোডোর পেরী কে ছিলেন ? (ঘ) মুৎসোহিনটা কে ছিলেন ? (ঙ) চীন-জাপান যুদ্ধ কোন্ সন্ধির দ্বারা অবসান ঘটল ? (চ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ? (ছ) রুশ-জাপান যুদ্ধ কোন্ সন্ধির দ্বারা অবসান ঘটল ? (জ) চীনের কাছে একুশ দফা দাবী কোন্ রাষ্ট্র উত্থাপন করেছিল ?

২। **সঠিক উত্তরটি রেখে অন্যগুলি বাদ দাও ঃ—**

(ক) জাপানের প্রধান সেনাপতিকে বলা হত (মিকাডো, সোগান, দাইমিও)

(খ) চীন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয় (খ্রীঃ ১৮৯৪-৯৫, ১৭৯৪-৯৫, ১৬৯৪-৯৫)

(গ) রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয় (খ্রীঃ ১৯০৪-০৫, ১৮০৪-০৫, ১৭০৪-০৫)

(ঘ) চীনের কাছে একুশ দফা দাবি করেছিল (আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড)

ঘটনাপঞ্জী

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে—জাপানে আমেরিকার বাণিজ্য বিস্তার

১৮৬৫ " —জাপানে বিদেশীদের প্রবেশ অধিকার লাভ

১৮৬৭ " —জাপানী সম্রাট মুৎসোহিটোর শাসনভার গ্রহণ

১৮৯৪-৯৫ " —চীন-জাপান যুদ্ধ

১৯০৪-০৫ " —রুশ-জাপান যুদ্ধ

১৯১০ " —জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিকার।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। জাপানের প্রধান সেনাপতিকে বলা হত সোগান।

২। জাপানী সম্রাটের নাম ছিল মুৎসোহিটো।

৩। সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা চীন ও জাপানের যুদ্ধের অবসান হয়।

৪। পোর্টসমাউথের সন্ধির দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হয়।

নতুন শাসন ব্যবস্থা ঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে বৃটিশ সরকারের ওপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। এই আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাণী, পার্লামেণ্ট এবং একজন ভারত-সচিবের ওপর রাখা হয়েছিল। এই আইন ভারত আইন নামে খ্যাত।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয় প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিচয় না থাকলে ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে এত বড় দেশ শাসন করা এবং এর জন্য আইন প্রণয়ন করা কঠিন। সুতরাং, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উডের প্রস্তাব অনুসারে পার্লামেণ্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাস করে। এই আইন ভারতে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের যে কাঠামো তৈরী করেছিল, তা বৃটিশ শাসনের শেষ অবধি স্থায়ী ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলে প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস ভারতবাসীর নানাবিধ অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি করলে সরকার কংগ্রেসের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠলেন। লর্ড ডাফারিন ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর সময়েই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে **কাউন্সিল্ অ্যাক্ট** গৃহীত হয়।

এই আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বাজেট প্রভৃতির আলোচনার অধিকার দাবি করে কাউন্সিলগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি

করা হল। সরকারকে শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করবার অধিকারও এই আইন দ্বারা স্বীকৃত হল। এই আইনে নির্বাচন প্রথার দ্বারা সদস্য নিয়োগের নীতি সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হল না। সুতরাং এই আইন ভারতীয় জনসাধারণের দাবি মাত্র আংশিকভাবে মেটাতে পেরেছিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের আইন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, জাতীয়তাবোধের প্রসার, সন্ত্রাসের উদ্ভব সব কিছু মিলে বৃটিশ সরকারকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণে বাধ্য করল। ভারত-সচিব মোর্লে এবং ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর করার জন্য যৌথভাবে চেষ্টা করলেন। তাই তাঁদের আমলে শাসনতন্ত্রের যে সকল পরিবর্তন ঘটেছিল, সেগুলি **মোর্লে-মিণ্টো সংস্কার** নামে পরিচিত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে পারল না। ভারতীয়রা চেয়েছিল দায়িত্বমূলক সরকার স্থাপন করতে। কিন্তু এই আইন উদারনৈতিক স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংস্কার দাবি পুনরায় উত্থাপন করা হল।

সাম্রাজ্য বিস্তার : বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতের নতুন শাসন-ব্যবস্থা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত রূপ দিতে সক্ষম হল না। বস্তুত, বৃটিশ কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন স্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পূর্ব সীমান্ত সমস্যারও উদ্ভব হয়েছিল। বৃটিশ সরকারের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি অহেতুক রুশ-ভীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সেইজন্য ইংরেজগণ আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাব অধিকারের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগান সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মরাজ শক্তিশালী হয়ে উঠলে বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করেছিল। পর পর তিনটি যুদ্ধের ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হয়ে ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে ভুটান রাজ্যের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। **দেওয়ানীগিরির** যুদ্ধে ভুটানের রাজা পরাজিত হয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ভুটানের রাজা ডুয়ার্স অঞ্চল বৃটিশকে ছেড়ে দিতে এবং বাৎসরিক করদানে বাধ্য হলেন। ভুটান তার পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বৃটিশ কর্তৃত্ব স্বীকার করেছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে তিব্বতের সাথে ইংরেজদের রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। লর্ড কার্জনের শাসনকালে তিব্বতীয় সরকার ইংরেজদের সাথে একটি

চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ফলে তিব্বতে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য করবার অধিকার স্বীকৃত হল। কিন্তু ১৯07 খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ চুক্তি দ্বারা তিব্বতের ওপর চীনের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। তিব্বতই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ অভিযান।

এছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন যাতে না হতে পারে সেজন্য বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির প্রয়োগ শুরু করল। এই সময় থেকেই বৃটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে শুরু করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার ঃ দীর্ঘকাল ইংরেজ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল, হস্তক্ষেপ করলে এ দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে এবং ইংরেজ অধিকার বিপন্ন হবে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবার পর ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। এর আগেই অবশ্য নিষ্ঠুর শিশু-হত্যা প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে ভারতীয়দের শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য না প্রাচ্য শিক্ষার ব্যাপারে ব্যয় করা হবে এই বিষয় নিয়ে দশ বছর ধরে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলেছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এবং কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় বেণ্টিঙ্ককে সমর্থন করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনে ঘোষণাপত্র জারী করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হল।

সতীদাহ প্রথার অবসান বেণ্টিঙ্কের স্মরণীয় কীর্তি। বহুদিন থেকেই হিন্দু সমাজে এই প্রথা চলে আসছিল। এই প্রথা অনুসারে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হিন্দু বিধবারা আত্মবিসর্জন করতেন। বেণ্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভারতবাসীর সহায়তায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত এক আইনের দ্বারা এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

বেণ্টিঙ্কের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি ঠগী দমন। উত্তর ও মধ্য ভারতে ঠগীরা দলবদ্ধভাবে লুণ্ঠন ও হত্যা করে বেড়াত। বেণ্টিকের নির্দেশে ছয় বছরের চেষ্টায় মেজর শ্লীম্যান ঠগীদলকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেন।

লর্ড ডালহৌসীর সময় ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। তাঁরই শাসনকালে গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের সংস্কার সাধিত হয়। ডালহৌসীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতের নানাস্থানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসীর উৎসাহ এবং বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ই বর্তমানে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু

বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার সম্বন্ধে মতামত ডালহৌসী সমর্থন করেন এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

লর্ড রিপণ কারখানার শিশু শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য কারখানা আইন প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন 'হাণ্টার কমিশন' নামে পরিচিত।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঃ ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে কেন্দ্র করে শহরগুলি অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন এভাবে ভারতকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল, তখনই ভারতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলেন এক বিশেষ সম্প্রদায়। ইংরেজদের অনুসরণ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাঁরা অংশ নিলেন এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে তাঁরা আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর ঐক্যলাভের সংগ্রামের কথা জানলেন। এর

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়

ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে দেশের প্রতি ভালবাসা, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নীতিও ভারতীয়গণের মনে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি করল। দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সরকারের উদাসীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। দেশময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হল। ভারতীয়গণ বুঝতে পারলেন, ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত না করলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য নতুন পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু হল। বৃটিশ সরকারের অন্যায়-অবিচার, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ও মনোবৃত্তির মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পেল। রাজা রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর অবদানে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন,

ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন—ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। অনেকে অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক বলে মনে করেন। হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন নামে এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির পক্ষ থেকেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বস্তুতঃ, এই ঐতিহাসিক সম্মেলনই 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' নামে পরিচিত হয়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের সভাপতি হন প্রখ্যাত আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মেলনের সদস্যদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরের বছর তৃতীয় অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। এই কংগ্রেসে বদরুদ্দীন তায়েবজী সভাপতি হন।

প্রথম দিকে কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ইংরেজ সরকারও কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করে। কংগ্রেসের এই পরিবর্তনকে ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেনি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরকারের নীতির সমালোচনা করলেও ইংরেজ শাসক-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেনি। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে কয়েকজন আবেদন-নিবেদন ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল।

চরমপন্থী আন্দোলন : ভারতীয়দের মধ্যে নবজাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার জন্ম ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেনি। নানারকম স্বৈরাচারী আইন পাস করে

আন্দোলনকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করা হল। অপরদিকে দেশের অগ্রসরপন্থী দল কংগ্রেসের এই মিনতিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা মহারাষ্ট্রের

বালগঙ্গাধর তিলক

শ্রীঅরবিন্দ

বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলায় **শ্রীঅরবিন্দ** এবং পাঞ্জাবে **লালা লাজপৎ রায়ের** অধিনায়কত্বে এক **চরমপন্থী** দল গঠন করলেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারত থেকে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করা। **কেশরী** পত্রিকার সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলক **গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের** প্রবর্তন করে ভারতের জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলেন।

চরমপন্থীরা স্থির করলেন যে, দেশের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন করে দেশের লোককে জাগিয়ে তুলতে হবে। শীঘ্রই এর সুবর্ণ সুযোগও উপস্থিত হল। এতদিন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একজন ছোটলাট দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। বড়লাট লর্ড কার্জন এই তিন প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করলেন। বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্বভাগ ও আসাম একত্র করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হল এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত হল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ ঘোষণা করলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য দেশময় প্রবল আন্দোলন হল। আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যও বর্জিত হল। এই আন্দোলন **স্বদেশী আন্দোলন** নামে খ্যাত। বাঙালী জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বদেশী আন্দোলনের দান কম নয়। বিদেশী পোশাক ছেড়ে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় নিয়ে বাঙালীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠল। চারণকবি মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক গান পূর্ব বাংলার শহর ও গ্রামের মানুষকে মাতিয়ে তুলল। সকলেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের **"বন্দেমাতরম্"** মন্ত্রে দীক্ষিত হল এবং বন্দেমাতরম্ রবে দেশের আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গোখেলের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস বাংলার এই আন্দোলন সমর্থন করায় জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হল। এই জাতীয় আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের চরমপন্থীদল ক্রমশঃ শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল।

বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করতে লাগলেন। এই দেখে চরমপন্থী যুবকদল সহিংস বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হল। বিপ্লববাদীরা গুপ্ত সমিতি গঠন করল, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করল, বোমা তৈরী করল এবং সরকারী কর্মচারীদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বোমা ফেলতে গিয়ে **ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী** ধরা পড়লেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বাংলাদেশে **যুগান্তর দল** গড়ে উঠল। আলিপুর বোমার মামলায় আসামী অরবিন্দ তাঁর জবানবন্দীতে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ করেছিলেন। বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে মামলা চালিয়েছিলেন। বিপ্লবী কানাইলাল ও সত্যেন আলিপুর জেলখানার মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রকে গুলী করে হত্যা করেন। কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসি হল। অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদের তীব্রতার ফলে বৃটিশ সরকার কিছু শাসনসংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব লর্ড মোর্লে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে **মোর্লে-মিণ্টো** সংস্কার প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এই সংস্কারে ভারতবাসী কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হল না এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের উপশম হল না। বাধ্য হয়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট **পঞ্চম-জর্জ** এক ঘোষণা দ্বারা বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ভারত অর্থ ও সৈন্য দিয়ে ইংলণ্ডকে যুদ্ধে সাহায্য করল। ভারতের নেতাদের আশা ছিল, যুদ্ধের শেষে ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার মেনে নেবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে নতুন সংস্কার আইন পাস হল, তাতে শাসনের দায়িত্ব জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর দেওয়া হল না। ফলে চরমপন্থীরা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হলেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সিপাহী বিদ্রোহের পর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও। ৩। ভারতবর্ষে

জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী দলের কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৪। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের কোম্পানীর শাসনের অবসানে কিভাবে নতুন শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল? ২। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী জাগরণের কারণ কি? ৩। "বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ" বলতে কি বোঝ? এই দলের নেতাদের নাম কি? ৪। স্বদেশী আন্দোলন কি? এই আন্দোলনের ফল কি হয়েছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন ঘোষণার দ্বারা হয়েছিল? (খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? (গ) কেশরী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? (ঘ) বাংলাদেশ বিভাগ কে করেছিলেন? (ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়েছিল?

ঘটনাপঞ্জী

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে—ভারতের নতুন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন।
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন;
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে—বঙ্গ-ভঙ্গ রদ।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণার দ্বারা ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।
২। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ঘোষিত হয়েছিল।
৩। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
৪। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
৬। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেন।

১২ অধ্যায়
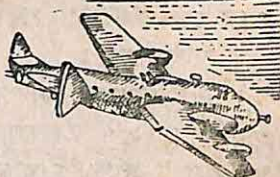
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কারণ ঃ কোন বিরাট যুদ্ধ বা বিপ্লব শুধুমাত্র একটি কারণে ঘটতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় নানারকম কারণের ঘাত প্রতিঘাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও নানা কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই দেখা দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল জার্মানির আক্রমণাত্মক মনোভাব। বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করেছিল। বিজ্ঞান ও কলকারখানায় উন্নতির ফলে জার্মানির ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির বৈদেশিক উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য ছিল অতি সামান্যই। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং জার্মানির ইতিহাসের পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করলেন যে, জার্মানি উপনিবেশ বিস্তারের জন্য চেষ্টা করবে। সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠিত করে তিনি জার্মানিকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করেন। বিসমার্কের নীতির পরিবর্তন করে তিনি ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে ইংলন্ড ও রাশিয়ার শত্রুতে পরিণত হলেন। মিত্রহীন ফ্রান্স অবিলম্বে রাশিয়াকে বন্ধু-রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করল। জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক মনোভাবও সফল হবার সুযোগ পেল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্ককে পদচ্যুত করলেন এবং সমস্ত শাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। দ্বিতীয় উইলিয়াম সমগ্র জাতির মনে এক জাতীয়তাবোধ এবং যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তুললেন।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জার্মানির স্থলবাহিনী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম তাঁর নৌবাহিনীকে ইংলন্ডের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে চাইলেন। ফ্রান্স ছিল জার্মানির চিরশত্রু। বিসমার্কের হাতে পরাজয় ও

অপমানের কথা ফরাসীরা ভোলেনি। জার্মানি শক্তিশালী হলে আবার যে ফ্রান্স আক্রমণ করবে, এই ভয়ে ফরাসীরা জার্মানির বিরোধিতা করতে লাগল। রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিল। জার্মানি সেদিকে নজর দিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করবার সঙ্কল্প করল। এর ফলে ক্রমে জার্মানির বিরুদ্ধে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হল। অন্যদিকে দ্বিতীয় উইলিয়াম অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। এইভাবে ইউরোপের দেশগুলি দুটি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ এই সময়ে একটি সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার **আর্ক ডিউক ফার্ডিনান্ড** বোস্‌নিয়ার রাজধানী **সেরাজিভো** শহরে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ওপর এই হত্যাকান্ডের যাবতীয় দোষ আরোপ করল। অস্ট্রিয়া সরকার সার্বিয়ার কাছে এমন কয়েকটি দাবী জানাল যা পূরণ করা সার্বিয়ার পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইসঙ্গে জার্মানিও অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। এদিকে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তুরস্কের সঙ্গে বহুদিন থেকেই রাশিয়ার শত্রুতা ছিল, তাই তুরস্ক যোগ দিল জার্মানির পক্ষে। ইতালী, জাপান, চীন ও পরে ইংলন্ডও ফ্রান্সের পক্ষ নিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু জার্মানরা সাবমেরিনের সাহায্যে অকারণে তাদের বহু জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ দিকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার পক্ষ **মিত্র শক্তি** নামে এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষ **মধ্য শক্তি** নামে পরিচিত ছিল।

যুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি ঃ মানুষের ইতিহাসে বার বার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এরকম বিশ্বব্যাপী সর্বনাশা যুদ্ধ এ পর্যন্ত আর হয়নি। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল প্রায় সমগ্র পৃথিবী। সেজন্য এই যুদ্ধের নাম **বিশ্বযুদ্ধ**। বিজ্ঞানের বলে নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হল, ডুবো জাহাজ, ট্যাঙ্ক, কামান, বিষবাষ্প, পরিখা যুদ্ধ, আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি নতুন নতুন মারণাস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগের ফলে এই যুদ্ধ অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করল এবং জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলল।

আগে যুদ্ধ হত দুই সেনাদলে, অসামরিক লোকের বিশেষ বিপদ ছিল না। কিন্তু এখন সমগ্র দেশই যুদ্ধের আওতার মধ্যে এসে পড়ল। অসামরিক লোক, স্ত্রীলোক, শিশু কেউই বাদ পড়ল না। স্কুল, হাসপাতাল, বাসগৃহ সবই বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমায় বিধ্বস্ত হল। যুদ্ধরত দেশগুলির সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। অফিসের এবং কলকারখানায় পুরুষের স্থান পূরণ করল মেয়েরা। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এল মহামারী ও দুর্ভিক্ষ।

প্রথম প্রথম জার্মানি প্রায় সর্বত্র জয়লাভ করেছিল। কিন্তু চার বছর ধরে যুদ্ধ চলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। জার্মানির মিত্র শক্তিরা একে একে আত্মসমর্পণ করল। জার্মানিতে খাদ্যাভাব ও নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হতাশ হয়ে, দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। এই দিনটি প্রতি বছর **যুদ্ধ-বিরতি-দিবস** হিসাবে পালন করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বড় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে—যেমন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জার্মানি। রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ফলে অনেক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নতুন পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড। ফলে ইউরোপের মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী সরকার জয়লাভ করলেও যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির দরুন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। বিশ্বরাজনীতিতে এই দুই শক্তির প্রভাব কমে যায়। মার্কিন দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয়তঃ, বিশ্বযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্বাধীনতা বা মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতে গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। চতুর্থতঃ এই যুদ্ধের ফলে গণতন্ত্রবাদ ও আন্তর্জাতিকতার প্রসার ঘটে; এবং সেই সঙ্গে নারীজাতির মুক্তি, শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার তীব্রতর হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উপায় হিসাবে জাতিসংঘ স্থাপিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের প্রতিক্রিয়া এবং জননেতা হিসাবে গান্ধীজীর আবির্ভাবঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। এই সময় ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা। জার্মানির দ্রুত শিল্পের প্রসার ও সামরিক প্রস্তুতি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ও নৌ-প্রভুত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। স্বভাবতই ইংলণ্ড সর্বশক্তি দিয়ে জার্মানিকে পরাজিত করতে চেয়েছিল। বৃটিশ সরকারের ধারণা ছিল যে, ভারতের জনগণ সর্বতোভাবে ইংলণ্ডকে সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য করবে এবং সকল প্রকার বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ রাখবে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে বৃটিশ সরকারের

প্রতি আকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সকল শক্তি দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এমনকি চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ফলে, ভারতবর্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় আট লক্ষ সৈন্য, পনেরো শত কোটি টাকা, অপরিমিত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্যের বিনিময়ে ভারতবাসী বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে শাসনতান্ত্রিক উদারতা বা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার আশা করেছিল। কিন্তু, যুদ্ধের শেষে বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ দমনমূলক নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে দ্রব্য-মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেল; দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও ভেঙে পড়ল। অপরপক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিও সেই সময় প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের বিপ্লবীরা বিপ্লবী কার্যকলাপ গ্রহণে সচেষ্ট হলেন। যুদ্ধের সময় সকল প্রকার বিপ্লবী কার্যকলাপ দমন করার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতে প্রতিরক্ষা আইন প্রবর্তন করল। তা সত্ত্বেও ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারতা ও ভারতীয়দের জাতীয় উদ্দীপনা দেশে ও বিদেশে দেখা দিল। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। আমেরিকা থেকে **গদর পার্টি** প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লাহোর, মীরাট, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের সামরিক ছাউনিতে গোপনে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার করতে লাগল। এমন কি, ভারতীয় সৈনিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বৃটিশ বিরোধী হয়ে উঠল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের সময়ে বালগঙ্গাধর তিলক ও মিসেস অ্যানি বেসান্ত নামে এক ইংরেজ মহিলা আয়ারল্যান্ডের অনুকরণে **"হোম রুল লীগ"** বা ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন সমিতি স্থাপন করেন। তিলক **"কেশরী"** ও মারাঠা পত্রিকার সাহায্যে হোম রুলের বার্তা সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। তিলকের বাণী "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" জনগণের মধ্যে গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত থেকেই ভারতীয়দের স্বায়ত্ত-শাসনের কথা তিনি প্রচার করেন। শীঘ্রই তিনি জনগণের নেতার মর্যাদা লাভ করেন এবং **"লোকমান্য"** হিসেবে স্বীকৃত হন। অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত হোমরুল আন্দোলন মাদ্রাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেসান্তের মুক্তি ও স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে হোমরুল আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দালনের মাধ্যমে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একই সময়ে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন বসল, ইতিমধ্যে হোমরুল আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধি করে। বৃটিশ সরকার মৌলানা আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ বহু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাকে নজরবন্দী করে রাখলে মুসলিস নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। এই বিষয়ে অগ্রণী হন মহম্মদ আলি জিন্না। এইভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তিকে বলা হয় লক্ষ্মৌ চুক্তি। লক্ষ্মৌ চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের নীতি মেনে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিরোধিতা ইসলামের ধর্মগুরু তুরস্কের খালিফার বিরুদ্ধে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। সুতরাং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার ও হোমরুল আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ভারত-সচিব মণ্টেগু ও ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড ভারতের জন্য একটি শাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হল। এই সংস্কার "মণ্ট-ফোর্ড" সংস্কার নামে পরিচিত। মণ্ট-ফোর্ড নামটি ভারত-সচিব মণ্টেগু নামের আদি অংশ এবং ভাইসরয় চেমসফোর্ডের নামের শেষাংশ নিয়ে গঠিত।

এই শাসন-সংস্কার মূলনীতি ছিল—(১) ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ থাকবে; (২) কেন্দ্রীয় শাসনের কোন মৌলিক পরিবর্তন হবে না; (৩) প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে (৪) ভারতের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির অধিকার ক্রমশ প্রসারিত হবে।

এই শাসন সংস্কারে দেশবাসী খুশী হল না। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রেরণায় এই নতুন সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস দেশবাসীর পক্ষ থেকে নতুন সংস্কার গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রত্যাখান করল এবং এই সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সভা সমিতি ও আন্দোলন আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিক্ষোভ দেখা দিল। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের "খলিফা" বা ধর্মনেতা। বৃটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ভারতের মুসলমানরা আন্দোলন শুরু করল।

সুতরাং, এই রকম পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সকল রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাউলাট

আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের দ্বারা (১) সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, (২) বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

এই দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন আরম্ভ হল। সারা দেশে হরতাল ঘোষিত হল। দেশময় অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। গান্ধীজী এই দিনটিকে জাতীয় শোকদিবস হিসেবে পালন করবার নির্দেশ দেন। পাঞ্জাবে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার চরম অত্যাচার দ্বারা এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করলেন। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র নর-নারীর উপর গুলি চালিয়ে জেনারেল ডায়ার বহুলোককে হত্যা করল। এই সংবাদে সমগ্র ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসীর এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের সূত্রপাত হল—ভারতের অসহযোগ আন্দোলন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ একাধিক কারণে ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ, এই বছর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি?
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল?
২। হোমরুল আন্দোলন সম্পর্কে কি জান?
৩। কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়েছিল?
৪। রাওলাট আইন কি?
৫। লক্ষ্ণৌ চুক্তি কি?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**
(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট বা কাইজার কে ছিলেন?

(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন? (গ) মিত্রশক্তি কাদের বলা হত? (ঘ) অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী কে ছিলেন? (ঙ) লক্ষ্মৌ চুক্তি কোন্ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়েছিল? (চ) হোমরুল আন্দোলনের নেতৃত্ব কারা দিয়েছিল? (ছ) রাওলাট আইন কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল? (জ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য কে দায়ী ছিলেন?

ঘটনাপঞ্জী

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানির সিংহাসনে বসেন।
১৮৯০ ,, বিসমার্কের পদত্যাগ।
১৯১৪ ,, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯১৮ ,, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান।
১৯১৯ ,, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

রুশ বিপ্লব

রুশ বিপ্লবের কারণ : জার-শাসিত রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রুশ বিপ্লবের মূল কারণ। বিপ্লবের আগে প্রায় তিনশ' বছর ধরে রাশিয়ায় এই জারতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রাশিয়া **রোমানভ** বংশীয় সম্রাটগণের শাসনাধীন ছিল। জারদের আমলে রাশিয়া ছিল একান্তভাবে পশ্চাদপদ একটি দেশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূমিদাস প্রথা (Serfdom) প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী জমির মালিক ছিল ভূস্বামীরা। অধিকাংশ কৃষকের জমির ওপরে স্বত্ব ছিল না। ভূমিদাসদের ভূস্বামীর জমিতে চাষ করতে হত এবং ভূমিদাসরা ছিল ভূস্বামীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। জমির ফসলের বেশীর ভাগই ভূস্বামীদের ঘরে তুলে দিয়ে আসতে হত। এই ভূস্বামীদের স্বার্থেই রাষ্ট্র পরিচালিত হত।

জারকে বলা হত **ভগবানের প্রতিনিধি**। জার যখন ভগবানের প্রতিনিধি তখন তাঁর সমস্ত কাজই ছিল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ভূস্বামী ও চার্চের সাহায্য পাওয়ায় জার দেশে অবিমিশ্র স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। বেতের ভয় দেখিয়ে ভূমিদাসদের শায়েস্তা করা হত। সেনাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিসের ভয় দেখিয়ে জার-বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে রাখা হত। এই সমস্ত উৎপীড়ন সত্ত্বেও যারা বিদ্রোহ করত তাদের জন্য সাইবেরিয়াতে প্রস্তুত ছিল নির্জন বন্দী নিবাস।

রাশিয়ায় যখন এই অবস্থা তখন ইউরোপের দেশে দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থান চলেছে। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী রাশিয়ার শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনেও প্রেরণা যোগাতে লাগল। রাশিয়ার ভূস্বামীদের মধ্য থেকেই একদল লোক বুঝতে পারলেন যে, ভূমিদাস প্রথা ও জারতন্ত্রই রাশিয়ার অগ্রগতির পক্ষে প্রধান বাধা। তাঁরা গুপ্ত সমিতি গঠন করে জারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। **১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের** ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ায় তাঁরা জারতন্ত্র বিরোধী

বিদ্রোহ সংগঠিত করলেন। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ হয়েছিল বলে এটি **ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহ** বলে পরিচিত। জারের সেনাবাহিনী অবশ্য নিষ্ঠুর বর্বরতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ দমন করল।

ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহ ভূমিদাস প্রথা ও জারতন্ত্রের অনাচার সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলল। কিছু পরে রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। ক্রিমিয়ার পরাজয় রাশিয়ার জারতন্ত্র-শাসিত সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা আরও স্পষ্ট করে তুলল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বুদ্ধিজীবীরা কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কৃষকেরা তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে, বুদ্ধিজীবিরা নিরুপায় হয়ে সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করলেন। রাশিয়ার এই সন্ত্রাসবাদীদের বলা হত **নিহিলিস্ট**।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাশিয়ার বিপ্লবীরা বুঝতে পারল যে, সন্ত্রাসবাদের পথে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। এই সময় থেকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার শ্রমিকেরা প্রথম ধর্মঘট করল। ক্রমে ক্রমে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল।

১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে রাশিয়ায় প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। দেশের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল এবং ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব ঘটল। সেই সুযোগে রাশিয়ার **বলশেভিক** দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভ শুরু হল। **পোটেমকিন** নামে একটি যুদ্ধ জাহাজের সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। জার বিপদ দেখে প্রজাদের কিছু ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ডুমা নামে এক পার্লামেণ্ট গঠন করলেন। কিন্তু ডুমায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থান পেল না। তাছাড়া, শাসন ব্যাপারে ডুমার কোন ক্ষমতাই রইল না। দেশের প্রকৃত শাসনভার ছিল **রাসপুটিন** নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে। তাই দেশের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্য পক্ষে, জার দেশ থেকে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কঠোর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করলেন। এই সময় রাশিয়ার জার ছিলেন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পৌত্র **দ্বিতীয় নিকোলাস**। জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন থেকেই গেল। বিপ্লবী নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু এই বিপ্লব বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যর্থ বিপ্লবের অন্যতম পরিচালক ছিলেন **ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন**। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিপ্লবী পরিবারে লেনিনের জন্ম হয়েছিল। লেনিন

রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তিনিই রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি বা বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন মতবাদের দিক থেকে কার্ল মার্কসের মন্ত্রশিষ্য। তিনি কার্ল মার্কস-বর্ণিত পথে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করতে অগ্রণী হলেন।

রাশিয়ার এই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দুটি ধারা বর্তমান ছিল। একটি

লেনিন

ট্রটস্কি

সংস্কারপন্থী ধারা—এদের বলা হত **মেনশেভিক**। আর একটি ছিল বিপ্লববাদী ধারা—এদের বলা হত **বলশেভিক**। রুশ ভাষায় মেনশেভিক শব্দের অর্থ সংখ্যাল্প এবং বলশেভিক শব্দের অর্থ সংখ্যাধিক্য। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক আন্দোলন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করল। এই আন্দোলনে তাঁর দুই সহচর ছিলেন **ট্রটস্কি ও স্তালিন**।

স্তালিন

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে রাশিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। যুদ্ধে জারের সেনাপতিরা বার বার পরাজিত হওয়ায় জারতন্ত্রের শক্তি লোকচক্ষে একেবারে হেয় প্রতিপন্ন হল। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় চক্রান্ত করে রাসপুটিনকে হত্যা করল (ডিসেম্বর ১৯১৬ খ্রীঃ)। কিন্তু দেশের দুরবস্থা তখন চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। দেশে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। খাদ্যাভাবের ফলে রাজধানী **পেত্রোগ্রাদ**-এ হাঙ্গামা দেখা দিল। সৈন্যরাও সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে

জনসাধারণের সাথে যোগ দিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লবে জারের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। বিপ্লবীরা জয়ী হলেন। আর, জার **দ্বিতীয় নিকোলাস** সিংহাসন ত্যাগ করলেন।

জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারল না। এই সরকার জনসাধারণকে শান্তির পথ দেখাতে পারল না। গরীবদের জীবিকার ব্যবস্থা হল না, জমির ওপর কৃষকদের আকাঙ্ক্ষিত মালিকানা স্বত্ব সাব্যস্ত হল না।

কাজেই জনসাধারণের বিক্ষোভ বন্ধ হল না। পেত্রোগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে শ্রমিক ও কৃষকদের **সোভিয়েট নামে** স্থানীয় সভা ছিল। রুশ ভাষায় সোভিয়েট শব্দের অর্থ **পঞ্চায়েত**। এই সভার মাধ্যমে তারা নিজেদের বিক্ষোভ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করল।

লেনিনের আহ্বানে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও সেনাবাহিনী অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রসর হল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে আবার একটি গণ-অভুত্থানের মুখে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন হল। বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলেন। নবগঠিত সরকারের প্রধান কর্মকর্তা হলেন লেনিন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল বলে এই দিনটি **রুশ বিপ্লব দিবস** হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ রুশ বিপ্লবের ফলে এক নতুন ধরনের সমাজ গড়ে উঠল। এই সমাজে শ্রেণীগত ভেদ নেই। দেশের সমস্ত জমি, কলকারখানা ও ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হল।

লেনিন এবং ট্রটস্কি সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ** গঠিত হয়েছিল এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এই সময়ে জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালী, হাঙ্গেরী ও চীন দেশে সাম্যবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সকল দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটেনি। বরঞ্চ জার্মানি ও ইটালিতে **ফ্যাসিবাদ** প্রবল হল, এবং চীনে **কুয়োমিণ্টাং** নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদী দল সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষভাবে আমেরিকা সাম্যবাদী রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক রাষ্ট্রজোট সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। রাশিয়ার আদর্শগত ও নীতিগত বিরোধ অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকলেও তারা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে মিত্রতা রেখে চলার পক্ষপাতী। ভারত এবিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সুতরাং, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী

ঘটনা। পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রুশ বিপ্লব এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছিল। রুশ বিপ্লব ঔপনিবেশিক জগতেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিপ্লব পরাধীন জাতিগুলির সম্মুখে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল। এককথায়, বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ওপর রুশ বিপ্লব এক চরম আঘাত হানে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের কারণ কি? ২। রুশ বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর। ৩। রাশিয়ার বাইরে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কিভাবে হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় কোন্ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল? ২। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা কেমন ছিল? ৩। রাশিয়ায় প্রথম বিদ্রোহ কিভাবে ব্যর্থ হল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি কি ছিল? (খ) কার্ল মার্কসের মন্ত্রশিষ্য কে ছিলেন? (গ) কার্ল মার্কসের নতুন মতবাদ কি? (ঘ) রাসপুটিন কে ছিলেন? (ঙ) ডুমা কি? (চ) দ্বিতীয় নিকোলাস কে ছিলেন? (ছ) বলশেভিক ও মেনশেভিক কথা দুটির অর্থ কি? (জ) লেনিনের দু'জন সহকর্মীর নাম কি? (ঝ) রুশ ভাষায় সোভিয়েট শব্দের অর্থ কি? (ঞ) তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ কত খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছিল?

ঘটনাপঞ্জী

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে—জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
১৯১৬ „ —রাসপুটিনের মৃত্যু।
১৯১৭ „ —রাশিয়ায় বিপ্লবীদের জয়লাভ ও জারের পতন।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল জার। ২। কার্ল মার্কসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন লেনিন। ৩। পোটেমকিন ছিল একটি যুদ্ধ জাহাজ। ৪। রাশিয়ায় 'ডুমা নামে একটি পার্লামেণ্ট ছিল। ৫। বিপ্লবের সময় রাশিয়ার জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস. ৬। রুশ ভাষায় সোভিয়েট শব্দের অর্থ হল পঞ্চায়েত।
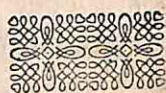
প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ঃ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে সকলে উপলব্ধি করল যে, ইউরোপকে এমনভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ না হয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠন করা, নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখা।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের কাজের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল "প্রধান চারজন" (Big Four)-এর উপর। ক্লিমেনশো সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

শান্তির আদর্শ নিয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। একমাত্র উড্রো উইলসনই রাষ্ট্রগত স্বার্থ ত্যাগ করে ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সমর্থক ছিলেন। তিনি সম্মেলনে জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন ও স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার জন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের কথা প্রচার করেন যা তাঁর "চোদ্দ দফা নীতি" নামে খ্যাত।

উড্রো উইলসন

কিন্তু উইলসনের চোদ্দ দফা নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। একদিকে দেখা গেল ন্যায়, সততা, মানবতা, শান্তি স্থাপন ও ইউরোপের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, অপরদিকে জার্মানিকে দুর্বল করে ইউরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা।

ইউরোপের পুনর্গঠন : প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ভার্সাই-এর সন্ধিতে ইউরোপের মানচিত্র নতুনভাবে গঠিত হল। অপরদিকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি, হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি এবং তুরস্কের সঙ্গে সেভরে-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হল।
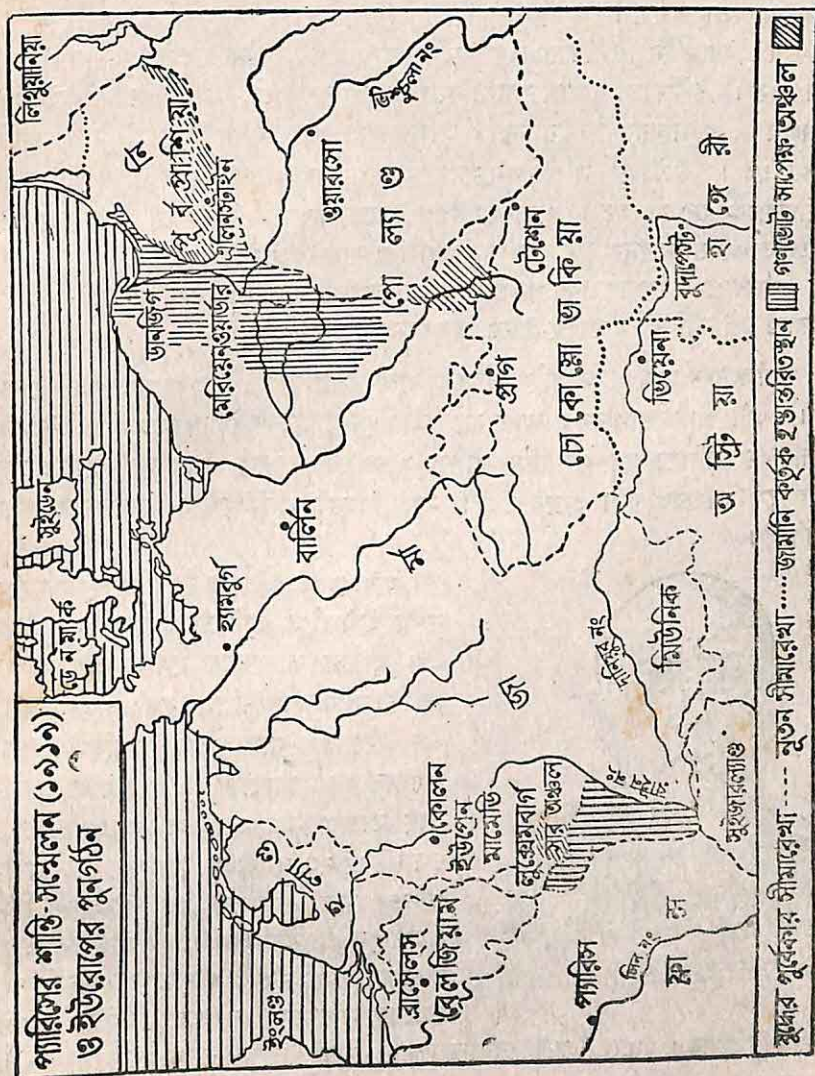
ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির কাছ থেকে আলসাস ও লোরেন নিয়ে ফ্রান্সকে দেওয়া হল। জার্মানির পূর্ব সীমায় পোল্যাণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গঠিত

হল। ফলে পোল্যাণ্ডের যে অংশ জার্মানির অধিকারে ছিল তা জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হল। পশ্চিম প্রাশিয়া অঞ্চল ও পোজেন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। জার্মানির সামরিক সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়। মেণ্ডেল ও ডানজিগ বন্দর জার্মানির হস্তচ্যুত হল।

সেণ্ট জার্মেইন ও ট্রিয়ানন-এর সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হয়। ইউরোপে চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া ও আলবেনিয়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। নিউলির সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়ার কিছু অংশ গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। তুরস্কের সঙ্গে সেভরে-এর সন্ধি অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া মাইনর, থ্রেস ও গ্যালিপলি গ্রীসকে দেওয়া হয়।

এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যেক জাতির নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে, একজাতি, একরাষ্ট্র এই নীতির ভিত্তিতেই ইউরোপের পুনর্গঠন করা হয়।

ফ্যাসিবাদের জন্ম ঃ ভার্সাই সন্ধিতে যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হল না। এটা শান্তিস্থাপনের সন্ধিপত্র নয়, আর একটি যুদ্ধের ঘোষণাপত্র মাত্র। কারণ, ভার্সাই-এর সন্ধিতে বা প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে কেবল পরাজিত জাতিগুলির ওপর যে অবিচার করা হয়েছিল তা নয়, বিজয়ী জাতিগুলিও নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছিল।

মুসোলিনী

যুদ্ধ-ক্লান্ত ইটালীর যখন এই রকম অবস্থা, তখন ইটালীতে **বেনিটো মুসোলিনী** নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তাঁর নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল। এই দলের নাম হল **ফ্যাসিস্ট** দল। ফ্যাসিস্টদের পোশাক ছিল কালো শার্ট, তাই তাদের নাম হয়েছিল **কালো শার্টের** দল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট দল প্রথমে গঠিত হয়। ফ্যাসিস্ট দল শীঘ্রই ইটালীর সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হল। অবশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী রোমে অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন। মুসোলিনী রোমের প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

রোমের পার্লামেণ্ট ভয় পেয়ে মুসোলিনীকে একাধিনায়কের ক্ষমতা দিলেন। মুসোলিনী বহু বছর ধরে একাধিনায়করূপে ইটালী শাসন করেন। তিনি

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দলগুলিকে ভেঙে দিলেন এবং তাদের নেতাদের নির্বাসিত করলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিবর্তে তিনি জাতীয় শৃঙ্খলা নীতি প্রবর্তন করলেন। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করার জন্য মুসোলিনী শাসনের খরচ কমিয়ে আয়-ব্যয় সমান করলেন। বেশী খাদ্য উৎপাদনের জন্য তিনি জলাভূমির জল বের করে তা চাষের যোগ্য করলেন। দেশের জলশক্তি থেকে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হল। ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করা হল। মুসোলিনীর চেষ্টায় দেশের নানাবিধ উন্নতি হল। তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য দেশের সমগ্র সম্পদ নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর সাহায্যে আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করে তিনি ইটালীতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন।

নাৎসীবাদের উদ্ভব ঃ ইটালীর চেয়ে জার্মানিতে অসন্তোষ ছিল অনেক বেশী। সেখানেও কমিউনিস্ট বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ যোগাতে গিয়ে জার্মানির জনসাধারণ দুর্দশার চরম সীমায় এসে পেঁছেছিল। তাই সেখানেও ইটালীর ফ্যাসিস্ট দলের মতো একটি দলের অভ্যুত্থানের পরিপূর্ণ সুযোগ ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগালেন আফ্রিকার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। তাঁর নাম **এড্‌লফ্ হিটলার**। হিটলার প্রথম জীবনে ছবি আঁকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মানির সেনাদলে যোগ দেন। তিনি সুযোগ পেলেই হোটেল, রেস্তোরাঁয়, রাস্তার মোড়ে ভার্সাইয়ের সন্ধির অবিচার সম্পর্কে বলতেন। তিনি বলতেন, "দেশের ইহুদী এবং কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের ফলেই জার্মানির পরাজয় হয়েছে। এরাই দেশের প্রকৃত শত্রু।" তিনি আরো বলতেন, "জার্মান জাতি প্রকৃত আর্যজাতি এবং পৃথিবীতে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তা আর্যরাই করেছে।"

তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তিনি এই দলের নাম দিলেন **জাতীয় সমাজতন্ত্রী** দল। এই দলই পরে **নাৎসী** বা **নাজী** নামে পরিচিত হয়। "মেইনক্যাম্ফ" (আমার সংগ্রাম) তাঁর রচিত আত্মজীবনীতে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ও নাৎসীদলের কর্মসূচীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নাৎসীদলের মূল নীতি ছিল উগ্র-জাতীয়তাবাদ, জার্মানি থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন ও গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধন।

নাৎসী দল ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মানির **চ্যান্সেলার** বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। তিনি "ফুহেরার" (নেতা) নামে পরিচিত হলেন। তিনি দেশকে একটি নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির ওপর অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া এবং ইউরোপে জার্মান একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই হিটলার ইহুদী ও কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন শুরু করলেন। হিটলার ভার্সাইয়ের সন্ধির অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবার জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন।

হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। প্রাচ্যে জাপানেরও উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করা। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানি, ইটালী ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল।

লীগ-অব্-নেশন্স্ বা জাতিসংঘ ঃ ভার্সাই সন্ধির বৈঠকের একটি প্রধান ফল হল লীগ-অব-নেশন্স্ বা জাতিসংঘ নামে একটি রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে জাতিসংঘের কার্যালয় স্থাপিত হল।

জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়া ও আপস-নিষ্পত্তির দ্বারা এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি করে যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাবনাকে দূর করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সকল সভ্যদের কাজ করতে হবে এবং সন্ধির সকল শর্ত মেনে চলতে হবে।

জাতিসংঘের কার্যাবলী ঃ যুদ্ধ নিবারণ করার উদ্দেশ্যে এই বিধান ছিল যে, সভ্যেরা পরস্পরের রাজ্যসীমা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা মেনে চলবে এবং বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে তা রক্ষা করবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ সভা (Assembly) এবং কার্যকরী সমিতি (Council) গঠিত হল। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের দায়িত্ব জাতিসংঘ গ্রহণ করেছিল। দাস-ব্যবসা বন্ধ করা, আফিম প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা, ব্যাধির প্রসার বন্ধ করা, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা প্রভৃতি জাতিসংঘের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। শ্রমিকমঙ্গল সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচার বা আইনগত মীমাংসার জন্য একটি স্থায়ী আদালত ছিল। হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগে শহরে এই আদালত বসত।

জাতিসংঘের সভ্যসংখ্যা ঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর সভ্যসংখ্যা ছিল ৪২। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সভ্যসংখ্যা হল ৬২। যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রেরই লীগে যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু চারটি রাষ্ট্রকে প্রথমে লীগের বাইরে রাখা হয়েছিল। তারা ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক ও রাশিয়া। সমস্ত বিজয়ী রাষ্ট্র এবং যুদ্ধে যারা যোগ দেয়নি, সেই সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র লীগের সভ্য হল। জার্মানি ও রাশিয়া অনেক পরে লীগে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কখনও লীগে যোগ দেয়নি। ফলে লীগের শক্তি যথেষ্ট কমে গিয়েছিল।

লীগ-অব-নেশন্স্-এর সাফল্য ঃ নানা কারণে লীগ-অব-নেশন্স্ ব্যর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু এর অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রধানতঃ, সামাজিক

অর্থনৈতিক ও মানবতার ক্ষেত্রে লীগ অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে নানাভাবে অর্থ সাহায্য করে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে, বিশ্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার করে এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে লীগ এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে লীগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবুও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ব্যাপারে লীগের ব্যর্থতার জন্য লীগকে সর্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। এর জন্য দায়ী ছিল লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব।

লীগের ব্যর্থতা ঃ লীগের ব্যর্থতার কারণ হলঃ (১) লীগের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার সদস্য রাষ্ট্রবর্গের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তুলতে কোন সদস্য রাষ্ট্রবর্গ সচেষ্ট ছিল না। (২) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। (৩) বিজয়ী রাষ্ট্র-গুলির প্রতি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সন্দেহ এবং জার্মানির প্রতিশোধাত্মক মনোভাব লীগের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। (৪) লীগের প্রতি সদস্য রাষ্ট্রবর্গের আনুগত্যের অভাব লীগের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। (৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগদান না করায় এবং রাশিয়া ও জার্মানি লীগে যোগদানের অধিকার না পাওয়ায় প্রথম থেকেই লীগের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। (৬) লীগের কোন নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী ছিল না।

তাছাড়া জাতিসংঘে কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রাধান্য থাকায়, তা কখনই ন্যায়ের পথে পরিচালিত হয়নি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করল ; ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইটালী জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিল না। এইভাবে জাতিসংঘ নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের সময় জাতিসংঘ ভেঙে গেল।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের বিবরণ দাও।
২। ফ্যাসিস্ট দলের কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল ? এই দলের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
৩। নাৎসী দলের কিভাবে উৎপত্তি হয় ? এই দলের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
৪। জাতিসংঘের কথা কি জান ? জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কি ভাবে ইউরোপের পুনর্গঠন করা হল ?
২। মুসোলিনীর কথা কি জান বল।

৩। হিটলারের কথা কি জান বল।
৪। জাতিসংঘের কার্যাবলী বর্ণনা কর।
৫। জাতিসংঘের কৃতিত্ব কি ছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ভার্সাই-এর শান্তি-সম্মেলনে প্রধান চারজন কারা ছিলেন? (খ) মুসোলিনী কে ছিলেন? (গ) হিটলার কে ছিলেন? (ঘ) জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল কি নামে পরিচিত হল? (ঙ) জাতিসংঘের কার্যালয় কোথায় স্থাপিত হয়? (চ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোথায় স্থাপিত হল? (ছ) কত খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল?

২। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান "√" চিহ্ন দিয়ে দেখাও ঃ—

(ক) জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। (খ) সদস্য রাষ্ট্রগুলি শান্তিরক্ষার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রীব ছিল না। (গ) জাপান, ইটালী ও জার্মানির সদস্যপদ ত্যাগ।

ঘটনাপঞ্জী

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে—ভার্সাই-এর সন্ধি।
১৯২০ " —জাতিসংঘ স্থাপন। ইটালীর ফ্যাসিস্ট দল গঠন।
১৯৩০ " —হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে নাৎসী দলের অভ্যুত্থান।
১৯৩৩ " —হিটলার জার্মানির প্রধান মন্ত্রী।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

১। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে **ভার্সাইয়ে** শান্তি বৈঠক বসেছিল।
২। চৌদ্দ দফা নীতির প্রবর্তক ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট **উড্রো উইলসন**।
৩। **মুসোলিনীর নেতৃত্বে** ইটালীতে ফ্যাসিস্ট দল গড়ে ওঠে।
৪। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন **এড্‌লফ্‌ হিটলার**।
৫। জাতিসংঘের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডের **জেনেভা শহরে**।
৬। আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল হল্যাণ্ডের **হেগ শহরে**।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পঁচিশ বছরের মধ্যে পুনরায় ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ভার্সাই-এর সন্ধিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। বিজেতার প্রতি অবিচারমূলক ব্যবহার এবং জাতীয়তাবাদী নীতি প্রয়োগের ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করে।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল জার্মানি তা ভুলে যায়নি। জার্মানির উপনিবেশগুলি অধিকার করা হয়। জার্মানির ওপর এক বিশাল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপান হয় এবং সামরিক শক্তি হ্রাস করা হয়। সুতরাং ভার্সাই-এর সন্ধির অবিচার জার্মানির নাৎসীবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। হিটলার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে প্রথমেই অস্ট্রিয়া অধিকার করেন (১৯৩৮ খ্রীঃ)। তিনি বললেন, জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। চেকোস্লোভাকিয়ায় কিছু জার্মান বাস করত। সেখানে জার্মানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এই অজুহাতে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করলেন (১৯৩৮ খ্রীঃ)।

হিটলার ও তাঁর নাৎসী দলের অভ্যুত্থানকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভালো চোখে দেখেনি। এর ফলে যে পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন হবে, সে বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন সচেতন ছিল এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি, ইটালী ও জাপান **এণ্টি-কমিণ্টার্ণ** বা কমিউনিস্ট বিরোধী সন্ধি করেছিল। তাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ধারণা ছিল যে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার শক্তি বৃদ্ধি করছেন। তাই হিটলারের প্রতিরোধের জন্য তারা কোন চেষ্টা করল না। সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করা শ্রেয়ঃ মনে করল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে **অনাক্রমণ** চুক্তি স্বাক্ষর করে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। এখন

আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিশ্চেষ্ট থাকতে পারল না। এভাবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল।

যুদ্ধের প্রকৃতি ঃ এই যুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানি ও ইটালী এবং দুবছর পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল জাপান; অপরপক্ষে ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দরে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বোমা ফেললে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয় এবং জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়াও যোগদান করে। এই যুদ্ধ প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। রাশিয়াসহ সমগ্র ইউরোপ, উত্তর-আফ্রিকা, পূর্ব-এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ যুদ্ধের প্রধান লীলাভূমি হয়েছিল।

হিটলার

এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা আরও ভীষণ আকার ধারণ করল। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানারকম বোমারু ও জঙ্গী বিমান তৈরী হল। জার্মানরা একরকম রকেট তৈরী করল। এইসব রকেট আপনা-আপনি এসে শত্রুপক্ষীয় দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়ত। **ভি-টু** নামে একশ্রেণীর উন্নত ধরনের রকেটের গতি ছিল শব্দের চেয়েও দ্রুত। যুদ্ধরত জাতিগুলির সর্বপ্রকারের শক্তি ও সম্পদ এই যুদ্ধে ব্যয়িত হয়েছিল।

যুদ্ধের গতি ঃ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মান সৈন্যবাহিনী অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে প্রায় সমগ্র ইউরোপ অধিকার করে নিল। প্রাচ্য মহাদেশে জাপানও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। ব্রহ্মদেশ অধিকার করে জাপানী সৈন্য ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এসে হানা দিল।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে জার্মান বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করল। স্টালিন-গ্রাডের যুদ্ধে রুশ সৈন্য জার্মান বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাস্ত করল। আফ্রিকায়ও ক্রমশঃ জার্মান বাহিনীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে লাগল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট **রুজভেল্ট**, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **চার্চিল** ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী **স্তালিনের** সমবেত চেষ্টায় বিভিন্ন যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ হতে লাগল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তি ইটালী জয় করল। আমেরিকার সমরায়োজন এবং চীনের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে জাপানও পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। ক্রমে ফ্রান্স এবং ইউরোপে জার্মান অধিকৃত অপরাপর অঞ্চল থেকে জার্মানি ও ইটালীর সৈন্যবাহিনী পশ্চাদ-পসরণ করতে বাধ্য হল। যুদ্ধে জয় অসম্ভব দেখে মুসোলিনী দেশ ছেড়ে

সুইজারল্যাণ্ডে পালাবার চেষ্টা করলেন। হিটলারও পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে মৃত্যুবরণ করলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে জার্মানির রাজধানী **বার্লিনের** পতন হল। জার্মানি ও ইটালী উভয়েই মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে আণবিক বোমার সাহায্যে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী জাপানের **হিরোশিমা ও নাগাসাকি** শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এই অবস্থায় জাপান বিনাশর্তে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল।

রুজভেল্ট

চার্চিল

যুদ্ধের ফলাফল ঃ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলেও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। বিজেতা ও বিজিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কেবল মতবিরোধই ছিল না; বিজয়ী শক্তিবর্গও পরস্পরের প্রতি সন্দেহপরায়ণ ছিল। ভারতবর্ষের মতো দু'একটি দেশ এই বিরোধে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, অপরদিকে আমেরিকা পরস্পর বিরোধী দুটি রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। রাশিয়ার ইচ্ছা সাম্যবাদের ভিত্তিতে পৃথিবীর রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠন করা; কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ড রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই অবস্থায়, যুদ্ধের অবসানেও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। যুদ্ধের ফলে জার্মানি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে—পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি। যুদ্ধের ফলে ইটালীতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবুও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি রক্ষার জন্য **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** (১৯৪৫ খ্রীঃ) গড়ে উঠল। এই কাজে নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন তিনটি রাষ্ট্র—আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সকল ভয়াবহ মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল সংক্ষেপে তাদের বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। এণ্টি-কমিণ্টার্ণ সন্ধি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

২। ভি-টু কি? কি উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করা হত?

৩। আণবিক বোমা কোন্ সময় ব্যবহৃত হয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কি কি নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি বন্ধনীর মধ্যে বসাও ঃ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কে কোন্ দেশের কর্ণধার ছিলেন?

(ক) হিটলার—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ( )

(খ) মুসোলিনী—ইংলণ্ড ( )

(গ) জেনারেল তোজো—জার্মানি ( )

(ঘ) চার্চিল—জাপান ( )

(ঙ) রুজভেল্ট—ইটালী ( )

ঘটনাপঞ্জী

১৯৩৯-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪১ ,, —পার্ল হারবার বন্দরে জাপানীদের বোমা নিক্ষেপ; আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান।

১৯৪৫ ,, হিটলারের মৃত্যু, জার্মানি ও জাপানের আত্মসমর্পণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন।

ভাল করে মনে রাখবে

১। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

২। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের পতন হয়।

৩। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিতে আণবিক বোমা ফেলেছিল।

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল।

———

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব হয়।

ইংরেজদের অপমান ও অত্যাচার থেকে প্রতিকারের জন্যে গান্ধীজী এক অভিনব নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই নীতির নাম অহিংস সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের অর্থ হচ্ছে সত্য অথবা ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা। গান্ধীজীর নিকট সত্য কথাটির অর্থ ছিল—পৃথিবীর সকলকে ভালবাসা এবং সকলের প্রতি অহিংস আচরণ করা।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে বড়লাট চেমসফোর্ড বিপ্লবী আন্দোলনকে দমনের জন্যে বিচারপতি রাউলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি নিয়ে যে আইন গঠিত হয় তা **'রাউলাট আইন'** নামে পরিচিত।

এই আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ গান্ধীজী দিনটিকে 'হরতাল দিবস' রূপে পালন করবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। গান্ধীজী সর্বভারতীয় নেতারূপে পরিচিত হলেন।

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পাঞ্জাবে অমৃতসরের শাসক জেনারেল ডায়ার এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে সর্বত্র সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জনসাধারণ জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা আহ্বান করে। সভা চলাকালীন জেনারেল ডায়ার বের হবার একমাত্র পথটি বন্ধ করে দেন। কোনরূপ সতর্ক না করেই জেনারেল ডায়ারের সৈন্যরা দশ মিনিট ধরে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। প্রায় এক হাজারেরও বেশী নরনারী নিহত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

খিলাফৎ আন্দোলন ঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা। ভারতের মুসলিমগণও ধর্মের দিক থেকে ছিলেন তুরস্ক সুলতানের অধীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজ বিরোধীপক্ষে যোগদান করে। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে পর দেখা গেল যে, খলিফার মর্যাদা নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। খলিফার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্যের সূচনা হল। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল। অসহযোগ আন্দোলনের দুটি মূল লক্ষ্য ছিল—এক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ লাভ এবং খিলাফৎ-এর দাবি পূরণ। ইংরেজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করে ভারতে বৃটিশ শাসন অচল করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী মাইকেল ও' ডায়ার সমেত সমস্ত দোষী ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি বিধানও দাবি করা হল। বলা হল যে, আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্যকে চরকায় সুতো কাটতে হবে ও খদ্দর ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে সর্বোদয় কর্মপন্থার উদ্ভব হয়।
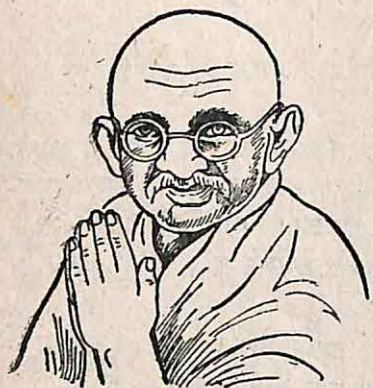
মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য মানুষ সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করল, অনেক খ্যাতনামা আইনজীবী আইনব্যবসা ত্যাগ করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহরু আইনব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। অগণিত ছাত্রছাত্রী আইনব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করল। এই আন্দোলনে গান্ধীজীকে সাহায্য করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

এতদিন কংগ্রেসের আন্দোলন সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হলেন।

আন্দোলন যখন তীব্র গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময় উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনায় (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) জনতার আক্রমণে বাইশজন পুলিশ

নিহত হয়। গান্ধীজী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই আন্দোলনের ফলে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও গণচেতনার সৃষ্টি করেছিল।

কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ ঃ অসহযোগ আন্দোলন একেবার ব্যর্থ হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা এবং বক্তৃতা মঞ্চ থেকে কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে নিয়ে এলেন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কৃষকদের দাবি ছিল মহাজনদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করা, জমিদারী প্রথা বিলোপ করা ও খাজনা এবং অন্যান্য করের বোঝা কমিয়ে দেওয়া। উত্তরপ্রদেশে প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকরা রায়বেরিলী, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্ষোভ করে। কৃষক-বিদ্রোহ গুজরাট, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কৃষকদিগকে নির্ভীকভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শিক্ষা দিলেন। ফলে, কৃষকদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল। কৃষকেরা জমিতে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কৃষকেরা সরকারী নির্যাতন উপেক্ষা করেও লবণ প্রস্তুত করল। এভাবে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষও প্রবল হয়ে ওঠে। সে সময় শ্রমিকদের বেতন কম ছিল ও তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। দেশের অনেক জায়গায় কৃষি-মজদুর সংঘ গড়ে ওঠে। রুশ বিপ্লবের কিছু পরে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট দলের গোড়াপত্তন হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হলে কলকারখানা ও রেলের শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। খড়্গপুরের রেলকর্মী ও জামসেদপুরে টাটার কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করে। আহম্মদাবাদে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

স্বরাজ্য দল ঃ অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কয়েকজন নেতা অসহযোগের বিকল্প কর্মসূচীর কথা চিন্তা করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জয়লাভ করে ও আইন পরিষদে প্রবেশ করে স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা সরকারের কাজে পর পর বাধা দিতে লাগলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে স্বরাজ্য দল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জাতীয় আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

সাইমন কমিশন : ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যা পর্যবেক্ষণের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন পাঠালেন। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয়কে নেওয়া হল না। জাতীয় কংগ্রেস কমিশন বয়কট করল।

আইন অমান্য আন্দোলন : ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। ভারতের জনগণ দারিদ্র্য ও চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিরূপে গান্ধীজী বড়লাট আরউইনের কাছে এগারো দফা দাবি পেশ করলেন। গান্ধীজীর দাবিগুলি সরকার অগ্রাহ্য করলেন। গান্ধীজী সবরমতীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভায় তাঁর অহিংস আন্দোলনের নতুন পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সকালে তিনি সবরবতী আশ্রম থেকে গুজরাটের সমুদ্র উপকূলে ক্ষুদ্র গ্রাম ডাণ্ডি অভিমুখে ৭৯ জন আশ্রমবাসীসহ যাত্রা করলেন। ২০০ মাইলের বেশি দূরত্ব গান্ধীজী ২৪ দিনে অতিক্রম করলেন। পথের পাশে গ্রামগুলির অসংখ্য লোক গান্ধীজীর অনুগমন করেছিল। ৬ই এপ্রিল সকালে ডাণ্ডির সমুদ্রে স্নান ও প্রার্থনা করে গান্ধীজী ডাণ্ডির সমুদ্র উপকূল থেকে লবণ সংগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। সমগ্র দেশে আলোড়নের সৃষ্টি হল। দেশবাসীকে লবণ আইন ভঙ্গ, মাদক দ্রব্য বর্জন, বিদেশী বস্ত্র বিক্রী বন্ধ করতে গান্ধীজী আদেশ দিলেন।

বঙ্গদেশের সত্যাগ্রহীরা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের মহিষাদলে সমবেত হয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। গান্ধীজী সুরাট জেলার ধারসনায় লবণের গুদাম অধিকার করতে মনস্থ করলেন। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে পাঠানরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল। গান্ধীজীর আদর্শ ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত হন। মতিলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুসহ বহু নেতা কারারুদ্ধ হলেন।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। আগের ঘোষণা অনুযায়ী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগদান না করাতে বৈঠকের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হল না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাট লর্ড আরউইনের একটা সাময়িক আপস-মীমাংসা হয়। এই মীমাংসার ফলে ইংরেজ সরকার অত্যাচার-মূলক আইন বাতিল করতে স্বীকৃত হলেন। বন্দী রাজনৈতিক নেতারাও মুক্তি পেলেন, অন্য দিকে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে স্বীকৃত হল এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করল। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলায় এ আলোচনাও ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয়ে গান্ধীজী দেশে ফিরলেন।

গান্ধীজীর ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তনকালে দেশে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি চলছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করে জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু হয়। জওহরলাল নেহরু, খান আবদুল গফফর খান কারারুদ্ধ হন। পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মূল সূত্রগুলি প্রকাশ করলেন। ভারতীয় ঐক্য নষ্ট করার অপচেষ্টাকে রোধ করার জন্য গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। উচ্চ হিন্দু বর্ণের নেতা মদনমোহন মালব্য এবং তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকরের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির কিছুটা সংশোধন হলে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন অপ্রয়োজনীয় মনে করে গান্ধীজী ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তা প্রত্যাহার করে নিলেন।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঃ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবী দলগুলি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হলে বিপ্লবী তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পায়। রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মনীষী বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেন। বাংলার বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার ইতিহাসে বাঙালীদের নেতৃত্বে এইরূপ সংগঠন, সাহস ও দৃঢ়তা দুর্লভ, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মিডফোর্ড হাসপাতালের ছাত্র বিনয় বসু পুলিশ ইনসপেক্টার জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করেন এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট হডসনকে গুরুতররূপে আহত করেন। এই দুঃসাহসিক কাজের পর ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল গুপ্ত কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে কারা বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পুলিশরা এই তিনজন তরুণকে ঘিরে ফেলে। ঘটনাস্থলে বাদল তীব্র বিষের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। বিনয় ও দীনেশ রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কয়েকদিন পর বিনয় হাসপাতালে মারা যান। দীনেশকে সুস্থ করে ফাঁসি দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে ভগৎ সিং অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ঃ

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার 'ভারত শাসন আইন' নামে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করলেন। এতে ঘোষণা করা হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে আইনসভা থাকবে এবং আইনসভার সদস্যারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। বৃটিশ সরকার সরাসরি অধীনস্থ প্রদেশগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন।

দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীন হতে পারবে। সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হল। ভারত শাসন আইনে ইংরেজ শাসনের কাঠামোর মধ্যে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হল মাত্র। জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনকে হতাশজনক বলে মন্তব্য করেন।

ক্রিপস-এর দৌত্য ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্রপক্ষের বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্বদিকে অগ্রসর হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া জাপানকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বৃটিশ সরকার বৃটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ক্রিপস প্রস্তাব করেন, যুদ্ধের পর ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান সভা আহূত হবে। যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে নিজস্ব সংবিধান রচনা করে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ক্রিপস-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ ক্রিপস-এর দৌত্যের ব্যর্থতা ভারতবাসীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। জাপানী সৈন্য ভারত সীমান্তে উপস্থিত হলে দেশবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। গান্ধীজী বললেন, ইংলণ্ড ও ভারতের স্বার্থে ইংরেজদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। ইংরেজ শাসনই জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্যনির্বাহ সমিতি ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের বিরূপ মনোভাব দেখে কংগ্রেস আগস্ট মাসে ব্যাপক অহিংস আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য'। এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র হল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' অর্থাৎ আমরা দেশকে স্বাধীন করব অথবা ঐ প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।

বৃটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চালালেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট ভোরবেলা গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। নেতৃত্বহীন এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়নি। বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন স্থানে ডাকঘর, পুলিশ ফাঁড়ি, রেল-স্টেশন প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে এই আন্দোলন গণ-বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। মেদিনীপুর জেলার মানুষেরা অপূর্ব সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল। তমলুকের থানা দখল করতে গিয়ে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কোন

কোন অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় সরকার। বাংলার তমলুক অঞ্চলে এই সরকার ২২ মাস পর্যন্ত তাঁদের স্বাধীন শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিলেন।

বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করবার জন্য পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করেন। অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী এই আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৃটিশ সরকার চরম দমননীতির আশ্রয় নিয়ে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নতুন এবং স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন আসন্ন।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। হিটলার যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছিলেন, সেই সময় সুভাষচন্দ্র ব্যাপকভাবে বৃটিশ বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করলে ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হয়। কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। অন্তরীণ থাকাকালে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি দেশত্যাগ করেন। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছান। সেখানে তিনি জার্মান সৈন্যদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। জার্মানীতে প্রবাসী ভারতীয়রাই প্রথম সুভাষচন্দ্রকে নেতাজীরূপে অভিহিত করেন। কিন্তু জার্মানী থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া অসুবিধাজনক মনে করে তিনি এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি অনুভব করেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মুক্তি-যুদ্ধ পরিচালনা করা সহজতর। ঠিক সেই সময় জাপান থেকে রাসবিহারী বসু আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পান।

সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৪৩-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে টোকিওতে উপস্থিত হলেন। সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলে রাসবিহারী বসু 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির পদে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করবার দিনে সুভাষচন্দ্রের 'দিল্লী চলো' আহবান আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করল।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর নেতাজী অস্থায়ী 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠন করলেন। তিনি হলেন এই সরকারের সর্বাধিনায়ক। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের রাজধানী ও কার্যস্থল স্থাপিত হয়। এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখা হয় শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যগণ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করল। তারা ভারতের পূর্বপ্রান্ত কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করল।

ইতিমধ্যে পূর্বরণাঙ্গনে জাপান পরাজিত হবার ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করতে পারল না। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। নেতাজী ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জের তাইহোকু থেকে বিমানযোগে যাত্রা করেন। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে ঘোষণা করা হয় (১৮ই আগস্ট, ১৯৪৫)। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই এই মত সমর্থন করেন না। নেতাজীর মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরিকল্পনা সফল হয়নি সত্য, কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সহজ হয়েছিল এবং ভারতের মুক্তি দ্রুততর করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাজদ্রোহের অভিযোগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের প্রকাশ্য বিচার আরম্ভ হলে ভারতীয় জনসাধারণ আজাদ হিন্দ বাহিনীর কীর্তি সম্বন্ধে জানতে পারে। বিচারে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের শাস্তির ব্যবস্থা হলেও শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চাপে তাঁরা মুক্তি পান।

নৌ-বিদ্রোহ : আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য বিচারে যখন সারা ভারত আলোড়িত, সেই সময় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ সমগ্র দেশকে চমকিত করে। দীর্ঘকাল ধরে নৌ-বাহিনীর সৈন্যরা উন্নত ধরনের চাকরির ব্যবস্থা ও উন্নত আহার্যের দাবি করে আসছিল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই বন্দরের 'তলোয়ার' জাহাজের নাবিকেরা প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বোম্বাই বন্দরের প্রায় সকল জাহাজই এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। দেখতে দেখতে করাচী, কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের নৌ-সেনারাও বিদ্রোহে যোগদান করে। বিদ্রোহীরা জাহাজ দখল করে বৃটিশ পতাকা অপসারিত

করে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোম্বাই ও করাচী বন্দরে নৌ-সেনা ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় নৌ-বিদ্রোহীগণ আত্মসমর্পণ করে। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতীয় সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে ভারত শাসন করা আর সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার পথে ভারত ঃ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জার্মানি এবং আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। অতঃপর ইংলণ্ডে স্যার এটলির নেতৃত্বে শ্রমিক দলের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এটলি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হলেন। সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক মন্ত্রী-মিশন ভারতে পাঠালেন। পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার এই তিনজন মন্ত্রী-মিশনের সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মন্ত্রী-মিশনের আলাপ-আলোচনা হল। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য মন্ত্রী-মিশন একটি **গণ-পরিষদ** গঠনের প্রস্তাব করেন। নতুন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবও করা হয়।

মুসলিম লীগ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে অসম্মত হয়, কিন্তু গণ-পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য বার বার দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে অস্বীকৃত হন। ফলে, মুসলিম লীগ "মন্ত্রী-মিশনের" পরিকল্পনা বর্জন করে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গণ-পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করল। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নার নির্দেশে মুসলমানরা প্রত্যক্ষ আন্দোলন আরম্ভ করে। এই **প্রত্যক্ষ সংগ্রাম** ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গারূপে দেখা দেয়। সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নির্বিচারে নরহত্যা চরম আকার ধারণ করল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ঃ মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। কিছু পরে মুসলিম লীগ এই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা গেল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব বাংলা ও পাঞ্জাবে নতুন করে শুরু হল। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে তাঁরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণায় মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট হল এবং পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভীষণ সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা আরম্ভ হল। এই অবস্থায় বাংলাদেশের হিন্দুগণ প্রায় একবাক্যে দেশ-বিভাগ

জওহরলাল জিন্না

অনুমোদন করল। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখগণও উপলব্ধি করল যে, দেশ-বিভাগের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে।

ইংরেজ সরকার লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট নিযুক্ত করলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এই আইন অনুযায়ী অখণ্ড ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হল এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নিল। পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ ও আসাম বিভাগের ব্যবস্থা করা হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ এই পাঁচটি দেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হল। বৃটিশ ভারতের বাকী অংশ ভারত নামেই পরিচিত হল। সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার সি. র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের এবং মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হলেন। শাসক-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতেই থাকে। জওহরলাল নেহরু ভারতের এবং লিয়াকৎ আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

ভারত-বিভাগের পরেও হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ চলতে থাকে। গান্ধীজী দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী এক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত হন। ভারতের ইতিহাসে এক মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারত রাষ্ট্র এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। পরে ফরাসী এবং পর্তুগীজরা ভারতের অধিকৃত স্থানগুলি পরিত্যাগ করে এবং সেই স্থানগুলিও স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়।

স্বাধীন ভারতের আদর্শ হল আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা করে চলা। পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় জাতির মতো ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক বিশিষ্ট সভ্য। ভারত এখন একটি উন্নত, প্রগতিশীল ও শান্তিকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির নেতৃত্ব করছে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সত্যাগ্রহ বলতে কি বোঝ? ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এর ফলাফল বর্ণনা কর।

৩। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কৃষক-শ্রমিকের ভূমিকা কতখানি প্রভাবিত করেছিল?

২। গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণে ভারতীয় জনমনে প্রতিক্রিয়া কি?

৪। ভারত ও পাকিস্তান—এই দুটি রাষ্ট্র কিভাবে হল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) সত্যাগ্রহ কথাটির অর্থ কি? (খ) মানবেন্দ্রনাথ রায় কে ছিলেন? (গ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির প্রবর্তক কে ছিলেন? (ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? (ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল? (চ) আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (ছ) মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফল কি? (জ) স্বাধীন ভারতের আদর্শ কি?

২। কোন্‌টি ঠিক বল ঃ

(ক) ভারতের রাজনীতিতে অহিংস সত্যাগ্রহ আদর্শের প্রথম প্রবর্তক ছিলেন (সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী)

(খ) সাইমন কমিশন গঠিত হয় (১৯২৭, ১৯১৭, ১৯১৯ খ্রীঃ)

(গ) সীমান্ত গান্ধী হলেন (আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গফুর খান, সওকৎ আলি)

(ঘ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি প্রবর্তিত হয় (১৮৩২, ১৯৩২, ১৯৩০ খ্রীঃ)

(ঙ) আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (জওহরলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু)

(চ) ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় (১৯৪০, ১৯৪৭, ১৯৫০ খ্রীঃ)

ঘটনাপঞ্জী

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।
১৯২২ " —অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।
১৯২৭ " —সাইমন কমিশন গঠিত হয়।
১৯৩০ " —আইন অমান্য আন্দোলন।
১৯৩১ " —গান্ধী-আরউইন চুক্তি।
১৯৩২ " —সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি।
১৯৩৫ " —ভারত শাসন আইন।
১৯৪২ " —ভারত ছাড় আন্দোলন।
১৯৪৬ " —মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।
১৯৪৭ " —ভারতের স্বাধীনতা লাভ।
১৯৫০ " —ভারতের নতুন সংবিধান রচিত হয়।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

(ক) তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের **খলিফা**।
(খ) আবদুল গফুর খান **সীমান্ত গান্ধী** নামে পরিচিত ছিলেন।
(গ) **সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা** নীতি প্রবর্তন করেছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড।
(ঘ) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে **আইন** অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটেছিল।
(ঙ) **আজাদ হিন্দ ফৌজের** প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।
(চ) **সিঙ্গাপুরে** আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
(ছ) জিন্না মুসলমানদের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বান করেন।
(জ) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে **ভারত ও পাকিস্তান**—দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

---

১৭ অধ্যায়

চীনের বিপ্লব

চীনের ঐক্য নাশ ও অশান্তি

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকারের সামনে অনেক সমস্যা দেখা দিল। দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে শান্তি স্থাপন করা হল সান-ইয়াৎ-সেনের প্রথম কাজ। এই কাজের প্রধান বাধা হল উত্তর চীনের সামরিক সর্দারদের প্রাধান্য। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে বহুদিন থেকেই বিরোধ ছিল। এখন তা এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, উত্তর ও দক্ষিণ চীনে দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। দক্ষিণে সান-ইয়াৎ-সেনের প্রাধান্য ছিল। উত্তরে সামরিক সর্দার প্রাক্তন মাঞ্চু সেনাপতি ইউয়ান-সি-কাই-এর প্রাধান্যও কম ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণের বিরোধ মেটাবার জন্য ইউয়ান-সি-কাইকে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট করা হল। ইউয়ান-সি-কাই ছিলেন একজন দুর্দান্ত সামরিক নেতা। বিদেশীরা তাঁর নাম দিয়েছিল **চীনের বলবান মানুষ**। কিন্তু ইউয়ান-সি-কাই-এর হাতে চীনের প্রজাতন্ত্র বিপন্ন হল। তিনি সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন। তিনি নিজেকেই সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। ফলে সুদূর ইউনান প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সমগ্র চীনে ইউয়ান-সি-কাই-এর গণতন্ত্রবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। তখন সান-ইয়াৎ-সেন অন্য একজন সামরিক সর্দারের সাহায্যে ক্যান্টনে পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে দেশে ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না।

তু-চুনদের কবলে চীন : ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান-সি-কাই-এর মৃত্যু হলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় চীন বিপ্লব পর্যন্ত চীনদেশের সমর নেতারা চীনের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। সমর নেতাদের বাহুবলেই চীনে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের উদ্যোগে ও কর্তৃত্বাধীনে একটি সংসদ গঠিত হল। এই সংসদের নাম হয়েছিল **তু-চুনদের পার্লামেন্ট**। কিন্তু সমগ্র দেশ এই নতুন দলের প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারেনি। এই সময়ে চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নানা কারণে জটিল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে গেল। সমর নেতারা কথায় কথায় মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা করতেন না। এঁদের শাসনাধীন স্থানসমূহের শাসন-ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে প্রগতিবিরোধী ছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমর নায়করা কোন চেষ্টা করতেন না।

চীনে শিল্পের ক্ষেত্রে কোন উন্নতির লক্ষণ ছিল না। সুতরাং, তু-চুনদের কার্যকলাপে চীনদেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। কারণ, এরা প্রায় সকলেই দম্ভ এবং অজ্ঞতার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। তু-চুনদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার শাসক **চ্যাং-সো-লিন**।

সান্-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দলঃ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে সান ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। কিন্তু দেশের ঐক্যস্থাপনে তাঁর সকল উদ্যম ব্যর্থ হল। চীন দেশে নানা সমস্যার বিরুদ্ধে সান-ইয়াৎ-সেন আপ্রাণ সংগ্রাম করলেন। তিনি তাঁর **কুয়োমিণ্টাং** দলকে নতুনভাবে গঠন করলেন। তখন থেকে এই দলের নতুন নাম হল **কুও-কুয়োমিণ্টাং** অর্থাৎ চীনের জনগণের জাতীয় দল।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জীবিকা সংস্থানের মূল নীতিগুলিকেও সান-ইয়াৎ-সেন কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছিলেন। গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তিন পর্যায়ের একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে, সামরিক শাসনের ব্যবস্থা ; দ্বিতীয় পর্যায়ে, দলের নেতৃত্বাধীনে শাসন পরিচালনা ও জনসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষালাভ ; তৃতীয় পর্যায়ে, সংবিধান রচনার পর পার্লামেণ্ট ও প্রেসিডেণ্টের গণতান্ত্রিক শাসন। তিনি তাঁর দলের মাধ্যমে চীনদেশে উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন।

৪ঠা মে-র আন্দোলনঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন অনেক আশা নিয়ে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু চীনের কোনই লাভ হল না। ১৯১৯ খ্রীঃ-র ভার্সাই সন্ধিতে চীনকে সাণ্টুং ফিরিয়ে না দেওয়ায় ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে, মিত্রবর্গের তা অজ্ঞাত ছিল না। এই অন্যায়ের আংশিক প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে **নবশক্তি সম্মেলন** ডাকা হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল। এই সন্ধিতে ভবিষ্যতে চীনের সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করবার এবং তার শাসন-ব্যবস্থায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

কিন্তু এই অন্যায় ও অপমানজনক সন্ধি দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্ষুব্ধ করেছিল। এই সময় একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। ৪ঠা মে-র আন্দোলন নামে পরিচিত এই আন্দোলন বিদ্যুৎ গতিতে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কুয়োমিণ্টাং দলভুক্ত নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় এবং বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় পিকিং-এ **৪ঠা মে-র আন্দোলন** আরম্ভ হল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করে ছাত্র সমিতি গঠন করা হল। এইভাবে চীনের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ঐক্য ও চীনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে থাকে।

সান-ইয়াৎ-সেন তাঁর তিনটি মৌলিক নীতির দ্বারা চীনের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন চীনে বিপ্লবের জনক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিপ্লবের পরিচালক।

কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্ট দলের সম্পর্ক ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রপক্ষে যোগদান করেছিল। কিন্তু প্যারিসের শান্তি বৈঠকে জাপানীদের বিরোধিতায় চীনের কোন দাবি অনুমোদিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে চীনে নৈরাশ্য ও হতাশা প্রবল হয়েছিল। চীনের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার হতে থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে একটি কমিউনিস্ট দল গড়ে ওঠে। অপরদিকে সান-ইয়াৎ-সেনের অনুগামী জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং দল ক্যাণ্টনে প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করেছিল। ফলে জাতীয়তাবাদের মধ্যে আদর্শের পার্থক্যের ফলে দলাদলি দেখা দিল।

এই বিশৃঙ্খলার অবসান করবার জন্য এবং সমগ্র দেশ ক্যাণ্টন সরকারের অধীনে আনবার জন্য কুয়োমিণ্টাং দল রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করল। রাশিয়া চীনে সাম্যবাদ প্রচারের জন্য উৎসুক ছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে সান-ইয়াৎ-সেন রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। **মাইকেল বরোডিন** নামে সাম্যবাদী রুশ নেতা চীনে এসে সান-ইয়াৎ-সেন এবং তাঁর সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করলেন। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপন হল। চীনা সাম্যবাদীগণকে কুয়োমিণ্টাং দলে গ্রহণ করা হল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেন চীন-রাশিয়া মৈত্রী স্থাপনের জন্য কুয়োমিণ্টাং দলকে আবার ঢেলে সাজালেন। এই বছরই তাঁর সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট দলের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে সাম্যবাদীরা নিজেদের পৃথক সংগঠন বজায় রেখে সদলবলে কুয়োমিণ্টাং দলে প্রবেশ করেন। কুয়োমিণ্টাং-এর যুক্তফ্রণ্ট গঠন হবার পর শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করবার বিশেষ দায়িত্ব চীনের কমিউনিস্টদের ওপর অর্পিত হল। কমিউনিস্ট ও কুয়োমিণ্টাং এই উভয় দলের গ্রাহ্য একটি কর্মসূচী রচিত এবং গৃহীত হল। কিন্তু এই সহযোগিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না। সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর রুশ-চীন মৈত্রীতে ভাঙন ধরল। চিয়াং-কাইশেক কুয়োমিণ্টাং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাশিয়া ও চীনের সাম্যবাদী দলের সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলেন।

চিয়াং-কাইশেক ও তাঁর নীতি ঃ কুয়োমিণ্টাং দল তথা চিয়াং সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। চিয়াং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা গোলমাল শুরু করে। এগুলির মধ্যে নানকিং-এর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর চীনের তু-চুনদের দমন করার জন্য চিয়াং-কাইশেক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীনে অভিযান শুরু করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাইশেক সাংহাই ও নানকিং দখল করেন। চিয়াং-কাইশেকের জাতীয় বাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একদল সেনা নানকিং দখল করে বিদেশীদের উপর অত্যাচার শুরু করল এবং কয়েকজনকে হত্যা করল। বিদেশী সরকারগুলি ক্ষতিপূরণ ও শাস্তি দাবি করলে চিয়াং-কাইশেক কমিউনিস্টদের কুয়োমিণ্টাং দল থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর শুরু হয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। তিনি সাংহাই-এ কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ দমন করেন এবং দেশের নানা জায়গায় কমিউনিস্টদের

হত্যা করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনী পিকিং দখল করে নিলে চীনের ঐক্য সম্পন্ন হল।

কিন্তু কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা দেখে চিয়াং-সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টরা কিয়াংসি প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

মাও-সে-তুং

চিয়াং-কাইশেক

কিন্তু কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের জন্য মাও-সে-তুং কমিউনিস্টদের
একত্রিত করে উত্তর-পশ্চিমে কমিউনিস্ট বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায়
ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ পথে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করেন। শেষে তাঁরা সেন্সি
প্রদেশে উপনীত হন। কমিউনিস্টদের এই দীর্ঘ পদযাত্রা ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর
কাহিনী।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট দল আক্রমণকারী জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার
আবেদন জানাল। কিন্তু চিয়াং-কাইশেক জাপানকে প্রতিরোধ না করে কমিউনিস্টদের
উচ্ছেদ করতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। চিয়াং-কাইশেকের এই নীতি তাঁর অনুগামীদের
পছন্দ হল না। চিয়াং-কাইশেক সিয়াং-ফু-তে এলে তাঁরই সেনাপতিদের কয়েকজন
তাঁকে হঠাৎ বন্দী করেন (১৯৩৬ খ্রীঃ)। এ অবস্থায় দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার
উপক্রম হলে চু-এন-লাই-এর মধ্যস্থতায় কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ঐক্য
স্থাপিত হল এবং দু' দলই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হল।

জাপানের চীন আক্রমণ ঃ চীনের গৃহযুদ্ধের সুযোগে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান
চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটিকে অধিকার করে। তারপর কয়েক বছর ধরে জাপান ক্রমশঃ
চীনের ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্টগণ একসঙ্গে যুদ্ধ
করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। চীন অবশ্য সম্মুখ যুদ্ধ করতে পারল না।
গেরিলা যুদ্ধ করে চীন জাপানকে বিব্রত করতে লাগলো। তারপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে

জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করলে চীন মিত্রপক্ষের কাছে প্রচুর সাহায্য পায়। জাপানের আর চীন জয় করা হল না।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কুয়োমিংটাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। কুয়োমিংটাং দলের কুশাসন এবং এই দলের সাথে কমিউনিস্ট দলের সংঘর্ষ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বিনষ্ট করেছিল। কুয়োমিংটাং সরকার ছিল বুর্জোয়া ও সামন্তদের সমর্থনপুষ্ট, চীনা জনসাধারণ থেকে এই সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করেও চিয়াং-কাইশেক কুয়োমিংটাং দলের আধিপত্য রক্ষা করতে পারলেন না। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধে কমিউনিস্টগণেরই জয় হয়। কমিউনিস্ট বাহিনী ছিল আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং গণ-সমর্থনপুষ্ট। কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে একের পর এক শহর দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাওয়ের নেতৃত্বাধীনে চীনের মূল ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হল। আর, চিয়াং-কাইশেক ও তাঁর কুয়োমিংটাং দল চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে চীনের বৃহৎ দ্বীপ **ফরমোজা** (তাইওয়ান) অধিকার করে সেখানে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাজ্যের পত্তন করেন। চীনের সাম্যবাদী দলের প্রভুত্ব বিস্তারে রাশিয়া সাহায্য করল। আর আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় তাইওয়ানে এখনও কুয়োমিংটাং সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। চীনের ঐক্যনাশ ও অশান্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। সান-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দল ও তাঁর নীতির সম্পর্কে কি জান বল।
৩। চিয়াং-কাইশেক ও তাঁর নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সান-ইয়াৎ-সেনের তিনটি মৌলিক নীতি কি ছিল?
২। ৪ঠা মের আন্দোলনের তাৎপর্য কি?
৩। কুয়োমিংটাং ও চীনের কমিউনিস্ট দলের সম্পর্ক কেমন ছিল?
৪। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ঘটনা কি ছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) চীনের বলবান মানুষ কে ছিলেন? (খ) তু-চুনদের পার্লামেণ্ট কাদের ছিল? (গ) সান-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দলের নাম কি ছিল? (ঘ) মাইকেল

বরোডিন কে ছিলেন ? (ঙ) চীন দেশে দীর্ঘ পদযাত্রায় কারা অংশ গ্রহণ করেছিল ? (চ) কার নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হল ?

ঘটনাপঞ্জী

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে—ইউয়ান-সি-কাইয়ের মৃত্যু।
১৯২৫ ,, —সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু।
১৯৩৪ ,, —কমিউনিস্টদের দীর্ঘ পদযাত্রা।
১৯৩৬ ,, —সিয়ানের ঘটনা।
১৯৪৯ ,, —মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

(ক) চীনের সমর নেতাদের বলা হত **তু-চুন**।
(খ) চীনের জনগণের জাতীয় দল ছিল **কুও-কুয়োমিণ্টাং**।
(গ) রাশিয়ার সাম্যবাদী নেতা ছিলেন **মাইকেল বরোডিন**।
(ঘ) মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৫ সালের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

সূচনা ঃ ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য যখন সংগ্রাম করছিল, তখন এশিয়ার আরও বহুদেশ বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। তখন এশিয়ায় অন্যান্য দেশের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। জনসাধারণ আর ঔপনিবেশিক শাসন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং যুদ্ধোত্তর কয়েক বছর বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী দলগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

ইন্দোচীন ঃ ইন্দোচীনের কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম ফ্রান্সের দখলে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেগুলি জাপানের হস্তগত হয়। বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে ফ্রান্স আবার এই রাজ্যগুলি দখল করতে অগ্রসর হয়। ফলে দীর্ঘকালব্যাপী এক যুদ্ধের সূচনা হয়। ভারত ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানালি। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ফরাসী পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিলেন এবং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা স্বীকার করার জন্য ফরাসী সরকারকে আবেদন জানান। এর ফলে যুদ্ধ-বিরতি ঘটে এবং **জেনেভা সম্মেলনে** তার মীমাংসা হয়।

হো-চি-মিন্

যুদ্ধ শেষে ভিয়েৎনাম উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হয়। উত্তর অঞ্চলে কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামও আমেরিকার অনুগ্রহপুষ্ট এক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই অঞ্চলের আদর্শ ভিন্ন, তাদের মধ্যে বিরোধও তীব্র।

ব্রহ্মদেশ ঃ ব্রহ্মদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ব্রহ্ম ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ব্রহ্ম অধিকার করে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে। জাপানকে প্রতিরোধের জন্য তখনকার জননেতা **আউংসানের** নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশে **অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট লীগ** গঠিত হয়। জাপানকে বাধা দিতে গিয়ে ব্রহ্মবাসীরা যে শক্তি অর্জন করে, যুদ্ধের শেষে ইংরেজকে তা মেনে নিতে হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ড ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বাধীন ব্রহ্মে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হল। স্বাধীন ব্রহ্ম ভারতের মত কমন্‌ওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মালয়েশিয়া ঃ মালয় ছিল ইংরেজ অধিকৃত রাজ্য। শ্যামদেশের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ এবং তার দক্ষিণ-প্রান্তে প্রসিদ্ধ সিঙ্গাপুর বন্দরটি অবস্থিত। আগে মালয়ে দুটি ইংরেজ উপনিবেশ এবং নয়টি ইংরেজ আশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ছিল। এদের ওপর ইংরেজদের ছিল বিশেষ প্রভুত্ব। কিন্তু এই সময়ে কমিউনিস্ট গেরিলারা নানাস্থানে বিশেষ উপদ্রব শুরু করে। ফলে ইংরেজ প্রভুত্ব বিব্রত হয়ে পড়ে। ক্রমে জাতীয় জাগরণও প্রবল হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ফলে তিনটি দল—মালয়ের জাতীয় দল, চৈনিক দল ও ভারতীয় কংগ্রেসী দল একত্রে **টুংকু আব্দুর রহমানের** নেতৃত্বে সমস্ত কেন্দ্রের নির্বাচনে জয়ী হয়। পরে ইংলন্ডে এক সম্মেলনে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ মালয়কে স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট দল গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে, বর্তমানে মালয়, সারওয়াক ও উত্তর বোর্ণিয়ো নিয়ে মালয়েশিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর বর্তমানে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়া ঃ মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট-বড় অনেকগুলি দ্বীপ আছে। এদের বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া নামে অভিহিত করা হয়। বিগত সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজেরা এই সব দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করে। তাঁদের আধিপত্যের ফলে দেশে কোন প্রকার ন্যায়-নীতির বালাই ছিল না। বৈদেশিক রাজশক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীদের শোষণ করে নিজেদের ভোগবিলাস ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। ক্রমে এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে দেশের জনশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই জাগ্রত শক্তি সংহত করে **সুকর্ণ** প্রধান নেতা হয়ে দাঁড়ালেন।

সুকর্ণের সঙ্গে ওলন্দাজদের বিরোধ তীব্রতর হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়

ওলন্দাজগণ সুকর্ণকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এদিকে জাপানীরা দেশ অধিকার করলে সুকর্ণ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। যুদ্ধশেষে জাপান ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করলে সেখানকার অধিবাসীদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসে। পুনরায় ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ায় এল আধিপত্য স্থাপন করতে। কিন্তু সুকর্ণ ও তাঁর সহকর্মী হাতা ও শাহী জাতীয় দল নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু রাজশক্তিকে প্রবল আঘাত হানলেন এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। তখন অনেক দেশ এই রাষ্ট্রকে মেনে নিল। এই ব্যাপারে ভারত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যার ফলে ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হল। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এই রাষ্ট্র স্বীকৃতি পেল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন রাষ্ট্রপুঞ্জ এই রাষ্ট্রকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলে স্বীকার করল। সেই সময় ভারতীয় প্রতিনিধি ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে বিশেষ সমর্থন জানায়। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া একটি উন্নতিশীল প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র।

সুকর্ণ

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কি জান ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

এককথায় উত্তর দাও :

(ক) কার নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?
(খ) কার নেতৃত্বে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট লীগ গঠিত হয় ?
(গ) কত খ্রীষ্টাব্দে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ?
(ঘ) সুকর্ণ কে ছিলেন ?
(ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেল ?

ঘটনাপঞ্জী

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।
১৯৪৮ ,, —স্বাধীন ব্রহ্মে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হল।
১৯৪৯ ,, —ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল।
১৯৫৭ ,, —মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভ।

● ভাল করে মনে রাখবে ●

(ক) হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।
(খ) ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ব্রহ্মে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল।
(গ) মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভ হল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।
(ঘ) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল।

১৯ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির মধ্যে স্বাধীনতার এক অদম্য স্পৃহা দেখা দেয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিক্ষোভ বিস্তারলাভ করে। এই যুদ্ধের সময় ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও শক্তি সঞ্চার করে। আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করে। এভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে।

আটলাণ্টিক চার্টার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলার অবসানে মানুষের মনে শান্তিকামনা প্রবল করে তুলেছিল। জাতিসংঘ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী আর একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দিল। বিশ্বে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল

যুদ্ধজাহাজে বসে রুজভেল্ট ও চার্চিলের শান্তির সনদ রচনা

আটলাণ্টিক মহাসাগরে এক যুদ্ধজাহাজে মিলিত হয়ে একটি সনদ রচনা করেন (১৯৪১ খ্রীঃ)। এটি আটলাণ্টিক সনদ বা চার্টার নামে খ্যাত। পরের বছর ২৬টি দেশ

এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। এই দেশগুলির মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। আটলান্টিক সনদে আটটি শর্ত ছিল ; যেমন, কোন রাষ্ট্র বিস্তার-নীতি গ্রহণ করবে না। কোন দেশের রাজ্যসীমা পরিবর্তন করা চলবে না ; ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব দেশের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হবে ; প্রত্যেক পরাধীন দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে ; জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে ; সকল জাতি নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বাস করতে পারবে এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত থাকবে ; সমুদ্রপথ সকল দেশের কাছেই সমানভাবে খোলা থাকবে ; সব দেশ সমরাস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে ইত্যাদি।

আটলান্টিক সনদ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার ভিত্তি বলা যায়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা : উহার উদ্দেশ্য : বিভিন্ন প্রাথমিক চুক্তি, সম্মেলন ও ঘোষণা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিত্তি রচনা করেছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাম্বার্টন ওক্‌স্ নামক স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের এক সভায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল আমেরিকার **সানফ্রান্সিসকো** শহরে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন ও ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বাক্ষর করেন। সেই বৎসর ২৪শে অক্টোবর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং তা রক্ষা করা। জাতি, ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে সবদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা। পৃথিবীর জনসাধারণের দুর্দশা দূর করা এবং তাদের স্বাধীনতা দান করা। ছয়টি প্রধান বিভাগ নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থা গঠন করা হয়। যথা, সাধারণ সভা, স্বস্তি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, অছি পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ এবং দপ্তরখানা। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-শান্তি ও মানুষের উন্নতির জন্য নানারকম কাজ করছে।

সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর সংঘবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে নানাপ্রকার বিভেদ সৃষ্টি হল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও আবার কতকগুলি দেশে —চীন, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানি, যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে, সোভিয়েটের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের নেতৃত্বে অপর একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। তবে, এই দুই দলের বাইরে আবার কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশও রইল। ভারতও একটি নিরপেক্ষ দেশ।

আধুনিক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল সমাজতন্ত্রবাদের জনপ্রিয়তা। শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানাপ্রথা সৃষ্টি হয়েছে আর তার দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর বণ্টন-ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। ফলে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অন্যায়মূলক পার্থক্য এবং মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ফলে সমাজতন্ত্রবাদ নামে এক চিন্তাধারার উদ্ভব হল। মূলত সমাজতন্ত্রবাদ অন্যায়মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরিদ্র ও শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হিসেবেই শুরু হয়েছিল। এই সমাজতন্ত্রবাদ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করেছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত দেশগুলিতে উপনিবেশ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। পূর্ব আফ্রিকায় জুলিয়াস নিরোবার পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধের আগে সাম্যবাদী দল গড়ে ওঠে ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন বিস্তারলাভ করে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। আটলাণ্টিক চার্টার কি?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। এককথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়?
(খ) আটলাণ্টিক চার্টারে স্বাক্ষরকারী নেতাদের নাম কর।
(গ) আমেরিকার কোন্ শহরের সম্মেলনে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন?

ঘটনাপঞ্জী

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে —আটলান্টিক মহাসাগরে সনদ রচিত হয়।
১৯৪৪ " —ডাম্বার্টন ওক্‌স্ নামক স্থানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা হয়।
১৯৪৫ " —সানফ্রান্সিসকো শহরে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সনদে স্বাক্ষর করেন ॥

● ভাল করে মনে রাখবে ●

(খ) আটলান্টিক চার্টারে স্বাক্ষরকারী দু'জন নেতার নাম ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল।
(খ) আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিপুঞ্জের সনদ স্বাক্ষরিত হয়।